দিন যায়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সুবর্ণরেখা
৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড। কলকাতা ৯

প্রকাশ · জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২

প্রকাশক : শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদার

সুবর্ণরেখা । ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড । কলকাতা ৯.

মুদ্রক : শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ

শ্রীঅরবিন্দ প্রেস । ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট । কলকাতা ৬

'রা-ম্বা'

আমার চার পিসিমা

শ্রীযুক্তা সুমতি বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্তা সরযূ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্তা পরিমল বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্তা চিন্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু

এই লেখকের :

পারাপার

ঘুণপোকা

দিন যায়

সীতাকে বহুকাল বাদে দেখল মনোরম।

দেখল, কিন্তু দেখা-হওয়া একে বলে না। দুপুরে উপর্ঝরণ বৃষ্টি গেছে। তারপর মেঘভাঙা রোদ উঠেছে। সমস্ত কলকাতা জলের আয়না হয়ে বেলা চারটের রোদকে ফেরত দিচ্ছে। ভবানীপুরের ট্রাম বন্ধ, চৌরঙ্গীর মুখে জ্যাম্। সবকিছু থেমে আছে, রোদ ঝলসাচ্ছে, ভ্যাপ্সা গরম। মনোরমের পেটে ঠাণ্ডা বীয়ার এখন দুর্গন্ধ ঘাম হয়ে ফুটে বেরোচ্ছে। লক্ষ্ণৌয়ের কাজ করা মোটা পাঞ্জাবি আর বিলাব টেরিকটন স্ট্রাইপ বেলবটম প্যান্টের ভিতরে মনোরম নিজের শরীরে কয়েকটা জলধারা টের পাচ্ছে। গরম, লালচে ঘাম তার। সীতা রাগ করত।

খাবারটা খাওয়াল বিশ্বাস। নতুন কারবার খুলেছে বিশ্বাস। ভারী নিরাপদ কারবার, ক্যাপিটাল প্রায় ন...

বড় কোম্পানিগুলোর ক্যাশমেমো ব্লকসুদ্ধ ছাপি...

নম্বর-টম্বর সহ। ব্যবসাদার বা কন্ট্রাক্টররা অ...

বিস্তর পারচেজ দেখায়। সেইসব ভুয়ো পারচে...

ভুয়ো রসিদ। মাল যদি না কিনে থাকো তবে 'কন্ট্যাক্ট বিশ্বাস। হি উইল ফিক্স্ এভরিথিং ফর ইউ।' যত টাকার পারচেজই হোক রসিদ পাবে, এন্ট্রি দেখাতে পারবে। সব বড় বড় কোম্পানির পারচেজ ভাউচার। বিশ্বাস এক পারসেন্ট কি দু' পারসেন্ট নেবে। তাতেই অঢেল, যদি ক্লায়েন্ট আসে ঠিকমতো।

কিন্তু কারবারটার অসুবিধে এই যে, বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় না। হাশ পাবলিসিটি। লোকে জানবে কী করে যে কলকাতার কোন গাড্ডায় বিশ্বাস বরাভয় উঁচিয়ে বসে আছে উদ্বিগ্ন আয়করদাতাদের জন্য? যে সব চেনা লোক কলকাতার বাজারে চালু আছে, তাদেরই বহাল রাখছে সে। কমিশন দেবে।

—দিস ইজ দি জিস্ট ব্যানার্জি! বিশ্বাস বলল—এবার ইন্টারেস্টেড মক্কেলদের টিপ্‌সটা দেবেন।

মনোরম কলকাতার ঘুঘু। শুনে-টুনে মৃদু একটু হাসল, বলল—বিশ্বাস, এর চেয়ে চিট ফাণ্ডের ব্যবসা করুন। এটা পুরোনো হয়ে গেছে। কলকাতায় অন্তত ত্রিশটা রসিদ কোম্পানিকে আমি চিনি।

বহুকাল আগে একটা ট্রেন দুর্ঘটনায় পড়েছিল মনোরম। শরীরের কাটাছেঁড়াগুলো মিলিয়ে গেছে, ভাঙা হাড় জুড়ে গেছে। কেবল জিভটাই এখনো ঠিক হয়নি। দাঁত বসে গিয়ে জিভটা অর্ধেক নেমে গিয়েছিল। জোড়া লেগেছে বটে, কিন্তু কথা বলার সময়ে থরথর করে কাঁপে। কথাগুলো একটু এড়িয়ে এড়িয়ে যায়। কিন্তু তাতে আত্মবিশ্বাস এতটুকু কমেনি মনোরমের।

বিশাল থলথলে চেহারার বিশ্বাস উত্তেজনায় চেয়ারে নড়ে বসে। মোকাম্বোর মজবুত চেয়ার তাতে একটু নড়বড় করে। [illegible] গরম শ্বাস ফেলে বিশ্বাস ঝুঁকে মুগুরের মতো দু'খানা হাতের কনুই দিয়ে ভর রাখল টেবিলের ওপর। বলল—ব্যানার্জি, আমার তিন মাসের ব্যবসাতে কত লাভ হয়েছে জানেন?

—কত?

বিশ্বাস শুধু মুখটা গম্ভীর করে অবহেলায় বলে—হুঁ!

মনোরম বলল—কিন্তু কম্পিটিশন তো বাড়ছে এ কারবারেও!

—ট্যাক্স পেয়ার কি কমে যাচ্ছে? জোচ্চুরি কমছে? যতদিন এদেশে প্রাইভেট সেক্টরে ব্যবসা থাকবে, ততদিন আমারও ব্যবসা থাকবে। এর মধ্যেই আমার ক্লায়েন্ট তিনশ' ছাড়িয়ে গেছে, দু-আড়াই লাখ টাকার রসিদ ইস্যু হয়েছে। অ্যাণ্ড উইদাউট মাচ পাবলিসিটি। আপনার স্বভাব হচ্ছে সব ব্যাপারের নৈরাশ্যের দিকটা দেখা। ভেরী ব্যাড।

বিশ্বাস ঠিক বলেনি। মনোরমের এটা স্বভাব নয়। নৈরাশ্যের দিকটা সে কখনো দেখে না।

বিশ্বাস বীয়ার খায় সরাসরি বোতল থেকে। বোতলের শেষ কয়েকটা ফোঁটা গলায় ঢেলে আবার নতুন বোতলের অর্ডার দিল। তারপর তেমনি মনোরমের মুখে ঝোড়ো লু-বাতাসের মতো শ্বাস ফেলে বলল—দেন ?

• মনোরম কিছুক্ষণ এক ঢোক বীয়ার মুখে নিয়ে তিতকুটে স্বাদটায় জখম জিভটা ডুবিয়ে রাখল। মুখের ভিতরে ঠিক যেন একটা জিওল মাছ নড়ছে। গিলে ফেলল বীয়ারটা। আস্তে করে বলল—কত কমিশন ?

—আমার কমিশন থেকে টুয়েন্টি-ফাইভ পারসেন্ট দেবো।

—আর একটু উঠুন।

—কত ?

—ফিফটি।

বিশ্বাস ভ্রূ তুলল না, বিস্ময় বা বিরক্তি দেখাল না। একটু হাসল কেবল। বিশ্বাস পঁয়তাল্লিশ পেরিয়েছে। তবু ওর দাঁতগুলো এখনো ঝকঝকে। নতুন বোতলটা তুলে নীরবে অর্ধেক শেষ করল। তারপর নিরাসক্ত গলায় বলল—ফিফ্‌টি ! অ্যাঁ ?

—ফিফ্‌টি।

—ব্যানার্জি, আমি যেমন প্রফিট করি তেমনি রিস্কটাও আমারই। ইনকাম ট্যাক্স নিয়ে গভর্নমেন্ট কি রকম হুজ্জত্‌ করে আজকাল জানেন না ? যদি ধরা পড়ি তো মোটা হাতে খাওয়াতে হবে নয়তো শ্বশুরাল ঘুরিয়ে আনবে। আমার প্রফিটের পারসেন্টেজ সবাই চায়, রিস্কের পারসেন্টেজ কেউ নেয় না। এটাই মুশকিল।

বিশ্বাস তেমনি ঝোড়ো শ্বাস ছাড়ে। ওর নাকের বড় বড় লোমের গুছি বের হয়ে আসে। গালের দাড়ি অসম্ভব কড়া, তাই রোজ কামালেও গালে দাড়ির গোড়া সব গোটার মতো ফুটে আছে। ঘন ভ্রূ। আকাশী রঙের বুশ শার্টের বুকের কাছ দিয়ে কালো রোমশ শরীর দেখা যায়। গলায় সোনার চেন-এ সাঁইবাবার ছবিওলা ছোট্ট লকেট।

মনোরম মুখে বীয়ার নিয়ে নড়ন্ত জিভটাকে ডুবিয়ে রাখে বীয়ারে। মুখের ভিতরে একটা চুক্‌চুক্ শব্দ হতে থাকে। শালার জিভটা নড়ছে অবিকল ছোট্ট মাছের মতন।

রসিদের কারবারটা মনোরমের কাছে ছেলেমানুষীর মতো লাগে। সে আস্তে করে বলল—আজকাল ফলস রসিদ টিকছে না। স্পটে গিয়ে এনকোয়ারি হয়, কোম্পানি নিজেদের সিরিয়াল নম্বর দেখে বলে দেয় যে, রিয়্যাল পারচেজ হয়নি। তখন মক্কেলরা ঝোলে।

বিশ্বাস উত্তেজিত হয়ে বলে—ঝুলবে কেন? আজকাল কেউ ঝোলে না। ধরা পড়লে খাওয়াবে কিছু।

মনোরম শ্বাস ছেড়ে বলে—খাওয়াবে আর খাওয়াবে। কত খাওয়াবে মশাই? এত খাওয়ালে নিজে খাবে কী? তার ওপর ফলস রসিদ ধরা পড়লে ক্রিমিনাল কেস হয়ে যায়।

বিশ্বাস ঝুঁকে বলল—আপনি আমার ইয়ে বোঝেন। আমি আরো তিনটে কোম্পানি চালাই ব্যানার্জি। সেগুলো অনেক বেশি রিস্কি। বলে উত্তেজিত বিশ্বাস ধবধবে সাদা রুমালে ঘেমো কপালটা মুছল। তারপর হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে বলল—আপনার ঐ একটা বড় বদ স্বভাব। পেসিমিস্টিক অ্যাটিচুড। ভেরী ব্যাড।

মনোরম নিরুৎসাহের হাসি হাসে।

বিশ্বাস বলল—একটা কথা মনে রাখবেন। না সুন্দরী বউ যার, হয় না যার শালা, তার ঘরে অলক্ষ্মী অচলা।

—মানে?

—মানে হচ্ছে 'না' কথাটা যার সুন্দরী বউয়ের মতো প্রিয়, 'হয় না' কথাটাকে যে নিজের শালার মতো খাতির-যত্ন করে, সে কখনো সাকসেসফুল হতে পারে না।

মনোরম বালকের মতো হাসে। এমন সে অনেক দিন হাসেনি।

বিশ্বাস স্মিতমুখে বলে—এক মহাপুরুষের কথা। আমি অবশ্য

বাজে ব্যাপারে প্রয়োগ করলাম।

—ঠিক আছে। মনোরম বলল—আমি দেখব।

—টুয়েন্টি ফাইভ ?

—টুয়েন্টি ফাইভ।

বিশ্বাস আত্মতৃপ্তিতে হাসল। বলল—এটা আমার সাইড বিজনেস। না টিকলেও ক্ষতি নেই। বন্ধুবান্ধবদের বলছি, যদি কাউকে কিছু টাকা পাইয়ে দিতে পারি। আপনার অবস্থা তো ভাল যাচ্ছে না ব্যানার্জি !

মনোরম মাথা নেড়ে বলল—না।

বিশ্বাস দুঃখিত গলায় বলল—হ্যাট উওম্যান ?

মনোরম শ্বাস ছেড়ে বলে—হ্যাট উওম্যান।

বিশ্বাস গম্ভীর চিন্তিত মুখে বলে—ব্যানার্জি, বউ বিশ্বাসী না হলে ভারী মুশকিল। আমাদের মতো বয়সে পুরুষ মানুষের বউ ছাড়া আর বিশ্বস্ত কেউ তেমন থাকে না। আমারও সব কিছু বউয়ের নামে। বাড়ি, গাড়ি, এভরিথিং। বউটা দজ্জালও বটে, কিন্তু ফেইথফুল।

মনোরম টাকরা দিয়ে নড়ন্ত জিভটাকে চেপে ধরে থাকে। রক্তের ঝাপটা তার মুখে লাগে। কান দুটো গরম হয়ে ওঠে।

বিশ্বাস সেটা খেয়াল করল না। বলল—দুপুরে বিজনেস পিক আওয়ার্স বলে বীয়ার বেশী খাই না। তারপর সন্ধ্যে হলে স্কচ থেকে শুরু করে দেশী কত কি গিলব তার ঠিক নেই। রাত দশটায় যখন ফিরব বউ ফারনেস হয়ে আছে। কলিং বেল টিপে আধতলা সিঁড়ি নেমে রেলিঙের পাশে লুকিয়ে বসে থাকি। বউ দরজা হাট করে খুলে দেয় তারপর উঁকিঝুঁকি না দিয়ে ভিতরে অপেক্ষা করে। আমি তখন আবার উঠে আসি। ভিতরে ঢুকি না। বাইরে থেকে এক পাটি জুতো পা থেকে খুলে ভিতরে ছুড়ে দিয়ে অপেক্ষা করি। যদি জুতোটা খুব জোরে ঘর থেকে ব্যাক করে আসে তবে বুঝি বউ আজ আপসে আসবে না, জোর খিচাঁন

হবে। যদি জুতো ব্যাক না করে তবে বুঝি বউ খুব খিচান করবে না, বড় জোর বাপ-মা তুলে দু একটা গালাগাল দেবে।

মনোরম এক নাগাড়ে হাসছে। গাল ব্যথা হয়ে গেল। বলল—থামুন মশাই, বিষম খাবো।

—ব্যাপারটা কিন্তু একজ্যাক্টলি এরকম। বাড়িয়ে বলছি না। যেদিন খিচান হয় সেদিন বউ মারধরও করে। চুল ধরে টানতে টানতে বাথরুমে নিয়ে যায়, তারপর দরজা বন্ধ করে···

—বাথরুমে কেন ?

—বাঃ, ছেলেমেয়েরা রয়েছে না! বলে বিশ্বাস সুখী গৃহস্থের মতো হাসে। বিশ্বাসের চেহারাটা যদিও মা দুর্গার পায়ের তলাকার অসুরটার মতোই—কালো, প্রকাণ্ড রোমশ এবং বিপজ্জনক, তবু এখন তার মুখখানা একটা গার্হস্থ্য সুখের লাবণ্যে ভরে গেল। বলল—কিন্তু তবু আমার বউ ফেইথফুল। লাইক এ বীচ। নানারকম মেয়েলী রোগে ভুগে শরীরটা শেষ করেছে। আমি আবার একটু বেশী সেক্সী, তাই আমাকে ঠিক এন্টারটেন করতে পারে না, অ্যাণ্ড আই গো টু আদার গার্লস।

—বউ জানে ?

বিশ্বাস মৃদুস্বরে বলে—জানে মানে আন্দাজ করে। তবে চুপচাপ থাকে। ভেরী কনসিডারেট। এটা তো ঠিক যে সে শরীরটা দিতে পারে না। তাই শরীর আমি বাইরে থেকে কিনি। কিন্তু তাছাড়া আমিও ফেইথফুল।

বিশ্বাস মৃদুস্বরে বললেও ওর ফিসফাস কথা দশ হাত দূর থেকে শোনা যায়। মনোরম আশপাশের টেবিলে একটু চেয়ে দেখে নিল। তারপর বলল—আপনি সুখী ?

—খুব। আপনার কেসটা কী ?

—বনত না।

—কেন ?

—বুঝতে পারতাম না। তবে আমাদের দু'জনেরই ছিল

পরস্পরের প্রতি এক রকমের বিপাললশান। সেটা বেড়ে বেড়ে একসময়ে কানেকশন কেটে গেল।

—স্যাড্।

মনোরম মৃদু একটু হাসল। বলল—আরো স্যাড যে, আমিও অন্য সকলের মতো বউয়ের নামে টাকা রাখতাম, জমি কিনেছিলাম, লকারেও কিছু ছিল। সেগুলোও হাতছাড়া হয়ে গেল।

—কিছু রিয়ালাইজ করতে পারেন নি?

—না। আমি প্রায় ব্যাঙ্করাপ্ট। আমার সম্বন্ধী দুঁদে অ্যাডভোকেট। ডিভোর্সের সময়ে মাসোহারারও বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। বিশ্বাস, আমার একটা ওপেনিং দরকার। যে কোনো একটা কাজ। আমি আবার দাঁড়াতে চাই।

বিশ্বাস গম্ভীর এবং সমবেদনার মুখ করে বলল—দেখব ব্যানার্জি, আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব।

—দেখবেন।

খাবার শেষ করে দুজনেই উঠেছিল। বাইরে তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। ভেজা পার্ক স্ট্রীটটাকে কুচকুচে কালো দেখাচ্ছিল। জলে ছায়া ফেলে নিথর দাঁড়িয়ে ছিল বিশ্বাসের গাড়িখানা। পুরোনো মরিস। তার সাদা রঙটা থেকে মেঘভাঙা রোদ পিছলে আসছে।

বিশ্বাসের গাড়িতে একটা লিফট পেতে পারত মনোরম। কিন্তু রেস্তরাঁর দরজায় বিশ্বাস তার একজন চেনা লোক পেয়ে গেল হঠাৎ।

অবিকল টেলিফোনে কথা বলার মতো বিশ্বাস চেঁচিয়ে বলল—হ্যালো! অরোরা, ইজনট ইট? বিসোয়াস হিয়ার।

দু'জনে আবার ঢুকে যাচ্ছিল রেস্তরাঁয়। বিশ্বাস ঘাড় ঘুরিয়ে বলল—আচ্ছা ব্যানার্জি, বাই।

মনোরম হাতটা তুলল। তারপর পার্ক স্ট্রীট ধরে হাঁটতে লাগল পশ্চিমমুখো।

ময়দানের ধার ঘেঁষে দক্ষিণমুখো ট্রামগুলো দাঁড়িয়ে আছে

সারি সারি। এতক্ষণ সে   ষ্টির জন্য আটকে ছিল গাড়ি-বারান্দায়, দোকানঘরে, বা   শেড এ। এখন সব সর্ষেদানার মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে চা   ট্রাম বন্ধ, বাসে তাই লাদাই ভীড়। হাতে পায়ে চুম্বকওয়ালা কলকাতাই লোকেরা বাসের গায়ে সেঁটে আছে অবলীলায়। বাসের গা থেকে অন্তত তিন হাত বেরিয়ে আছে মানুষের নশ্বর শরীর।

মনোরমের ঠিক এক্ষুনি কোথাও যাওয়ার নেই। যতক্ষণ বীয়ারের গন্ধ শরীরে আছে ততক্ষণ গড়িয়াহাটার কাছে মামার কাঠগোলায় ফেরা যাবে না। বৃষ্টির পর এসপ্লানেড এখন ভারা ঝলমলে, রঙীন শো-উইনডোতে দোকানের হাজার জিনিস, রঙীন পোশাকের মানুষ, রঙীন বিজ্ঞাপন। টেকনিকালার ছবির মত। চারদিকের চেহারা এখন ধুলোটে ভাবটা ধুয়ে যাওয়ার পর। কাজ না থাকলেও এসপ্লানেডে ঘুরলে সময় কেটে যায়।

রাস্তা পার হয়ে মেট্রোর উল্টোদিকে চাঁদনির চাতালে বসল উঠে-যাওয়া পসারীরা। দ্রুত হাতে ঝুড়ি কেউ-পুতুলের বাক্স, চুলের কাঁটি কিংবা মনোহারী জিনিস সাজাচ্ছে। ট্রাম টার্মিনাসে দাঁড়িয়ে আছে। ফাঁকা ট্রাম। তারই একটাতে উঠে একটুক্ষণ বুঁদ হয়ে বসে থাকবে ভেবেছিল মনোরম। ফুটপাথ ছেড়ে ইট বাঁধানো চাতালটায় নামতে গিয়েও সে বাড়ানো পা টেনে নিল। সীতা না?

সীতাই। সোনা রঙের মুর্শিদাবাদী শাড়ি পরনে, ডান হাতে ধরা একটা কাগজের প্যাকেট বুকে চেপে সাবধানে হাটছে বাঁ হাতে শাড়িটা একটু তুলে পা ফেলছে মাথা নোয়ানো। পাতলা গড়ন, ছিপছিপে ছোট্টো মাথা। নরম মুখশ্রী, কাগজের মত পাতলা ধারালো ছোট্ট নাক লম্বাটে মুখখানা, ছোট্টো কপাল, চোখের তারা দুটি ঈষৎ তাম্রাভ, মাথার চুল বব্ করা। বেশ একটু দূরে সীতা, ওর মুখখানা সঠিক দেখতে পেল না মনোরম। কিন্তু দূর থেকে দেখেই সবকিছু সীতাকে মনে পড়ে গেল। ছয় সাত

বছর ধরে সীতার সবটুকু দেখার কিছুই তো বাকি ছিল না! আশ্চর্য কার্যকারণ! একটু আগে বীয়ারের বোতল সামনে নিয়ে সে হোঁতকা বিশ্বাসটার কাছে সীতার কথা বলছিল।

একটা রগ মাথার মধ্যে ঝিন্‌ন করে চিড়িক দেয়। মনোরম গাছের মতো দাঁড়িয়ে থেকে দেখে, কী সুন্দর অপরূপ রোদে সীতা একটু ভেঙে নুয়ে মহান মানুষের মতো হেঁটে চলেছে। সব জায়গা থেকে হঠাৎ সূর্যরশ্মিগুলি থিয়েটারের আলোর মতো এসে ওকে উদ্ভাসিত করে। পিছনে মরা গাছ, মেঘলা আকাশ, এসপ্লানেড ঈস্টের বাড়ির আকাশরেখা, চার দিকে ফড়ে, দালাল, দোকানীর আনাগোনা। কিন্তু আবহের আলো এই ভীড়ে কেবলমাত্র সীতাকেই উদ্ভাসিত করে। সোনালী শাড়িটা আগাগোড়া সোনালী, কোথাও কোন কাজ নেই, আঁচল নেই, সোনালী ব্লাউজ, পায়ে কালো সরু স্ট্র্যাপের চপ্পল—সবটুকু ঝলসায় এই রোদে, কিংবা রোদই ঝলসে ওঠে ওকে পেয়ে? পেটে অঢেল বীয়ার, তাই ঠিক বুঝতে পারে না মনোরম। ব্লাডারটা জলে ভারী হয়ে টনটন করছে, একটা কেমন গরমী ভাপ বেরোচ্ছে শরীর থেকে, আকণ্ঠ তেষ্টা। (ভিখিরি যেমন ঐশ্বর্যের দিকে তাকায়, তেমনি অপলক তাকিয়ে থাকে মনোরম। মনে হয় এই সীতাকে সে কখনও স্পর্শ করেনি।)

কোথায় যাচ্ছে সীতা? কোথায় এসেছিল? বোধহয় বেহালার ট্রাম ধরতেই যাচ্ছে। ওদিকের ট্রাম চালু আছে কি? চালু থাকলেও এই ভীড়ে উঠতে পারবে তো সীতা? ভাবল একটু মনোরম।

সীতা ট্রাম লাইন বরাবর হেঁটে গেল, একটু দাঁড়াল, চেয়ে দেখল দু'ধারে। তারপর দুটো থেমে থাকা ট্রামের মাঝ দিয়ে সুন্দর পদক্ষেপের বিভঙ্গ তুলে ওপাশে চলে গেল। দৃশ্যের শেষে যেমন মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়, নেমে আসে পর্দা, তেমনই হয়ে গেল চারধার। কিছু আর দেখার রইল না।

মনোরম চলল চাতালটা পেরিয়ে গোলঘরের দিকে। তীব্র অ্যামোনিয়ার গন্ধের ভিতরে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করল। এবং বেরিয়ে আসার পর টের পেল, ভীষণ একা আর ক্লান্ত লাগছে। কোথাও একটু যাওয়া দরকার এক্ষুনি। কারো সঙ্গে কথা বলে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক থাকা দরকার। সীতাকে দেখার ধাক্কাটা সে ঠিক সামলাতে পারছে না। সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না যে, সে সত্যিই সীতাকে দেখেছে। এমন আচমকা হঠাৎ কেন যে দেখল। দেখল, কিন্তু দেখা হওয়া একে বলে না।

আকাশ আজ খেলছে। দ্রুত গুটিয়ে নিল রোদের চাদর। বৃষ্টিটা চেপে আসবে। দু' চারটে চড়বড়ে ফোঁটা মনোরমের আশেপাশে যেন বা হেঁটে গেল। ততক্ষণে অবশ্য মনোরম লম্বা পা ফেলে জোহানসন অ্যাণ্ড বো-র অফিস বাড়িটায় পৌঁছে গেছে।

পুরোনো সাহেবী অফিস। বাড়িখানা সেই সাহেব আমলের গথিক ধরনের। শ্বেতপাথরের মতো সাদা রঙ, বৃষ্টিতে ভিজেও শুভ্রতা হারায়নি। সামনে খানিকটা সবুজ যত্নরচিত জমি, শেকল দিয়ে ঘেরা। বাঁকা হয়ে ড্রাইভওয়ে ঢুকে গেছে। সার সার গাড়ি দাঁড়ানো। তার মধ্যে সমীরের সাদা গাড়িটা দেখল মনোরম অফিসেই আছে।

চমৎকার কয়েকটা থামে ঘেরা পোর্টিকো পেরিয়ে রিসেপ্‌সনের মুখোমুখি হওয়ার আগে মনোরম আকাশটা দেখল। গীর্জার ওপর ক্রুশচিহ্ন, তার ওপাশে আকাশটা সাদা বৃষ্টির চাদরে ঢাকা। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। সীতা কি ট্রামে উঠেছে? না হলে ভিজবে, খুব ভিজবে।

রিসেপসনের বাঙালী ছেলেটা চমৎকার ইংরেজিতে বলে—সমীর রায়? অ্যাকাউন্ট্‌স্, আপ ফার্স্ট ফ্লোর।

মনোরম মাথা নেড়ে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে। শ্বেত পাথরের প্রাচীন এবং রাজসিক সিঁড়ি। বহুকাল ধরে পায়ে পায়ে ক্ষয়ে

গিয়ে ধাপগুলো নৌকোর খোলের মতো দেবে গেছে একটু। তবু সুন্দর দোতালার মেঝেতে পা দিলে মেঝেতে পারসিক কার্পেটের সূক্ষ্ম এবং রঙীন সুতোর মতো কারুকাজ দেখা যায়। কোথাও কোথাও ফাটল ধরেছে, তবু তেলতেল করছে পরিষ্কার। মোটা দেওয়ালের মাঝখানে নিঃশব্দ করিডোর, তাতে বদ্ধ বাতাসের গন্ধ। অফিসবাড়িটায় পা দিলেই একটা 'গুডউইলের' অলক্ষ্য অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। গুডউইল। বিশ্বস্ততা, এবং সুনাম।

একটা বড় হলঘরের একধারে টিকপ্লাইয়ে ঘেরা চেম্বার। সেখানে সমীর রায় বসে। সামনে প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিল, তার ওধারে সমীর। মনোরমের ভায়রাভাই। কিংবা ভূতপূর্ব ভায়রাভাই। লম্বা চেহারায় এখন একটু মেদ জমেছে, রঙটা কালোই ছিল, এখন ইটচাপা ঘাসের মতো ফর্সা হয়েছে। ভাল খায়-দায়, গাড়ি চড়ে বেড়ায়, গায়ে রোদ লাগে না। গলায় সরু টাই, চেয়ারের পিছনে কোট ঝুলছে। ঝুঁকে একটা কাগজ দেখছিল সমীর। চমৎকার একজোড়া মদরঙের ফ্রেমের চশমার ওপর ওর বড় কপাল, লালচে চুল, টিকোলো নাক, এবং গভীর খাঁজওলা থুঁতনিতে আভিজাত্য ফুটে আছে। সেই মুখশ্রীতে ওর চুয়াল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সটা ধরা যায় না। অনেক কম বলে মনে হয়।

মনোরমের কোনো কাজ নেই। ব্যস্ত সমীরের কাছে দু'দণ্ড বসা কি সম্ভব হবে! দু'চারটে কথা কি ও বলবে মনোরমের সাথে! একটু দ্বিধা ও অনিশ্চয়তায় ও টেবিলটার কাছাকাছি এল।

সমীর মুখ তুলে বলল—আরে, মনোরম! কী খবর?

তীক্ষ্ণ চোখে মনোরম সমীরের মুখখানা দেখে নিল। না, খুশী হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। চোখদুটি সামান্য বিস্ফারিত হয়েই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। (যারা অভিজাত তাদের একটা সুশিক্ষা আছেই, মনোভাব তারা ঢেকে রাখতে পারে। বিস্ময় এবং বিরক্তিকে অনায়াসে চাপা দিয়ে সমীর হাসল।)

—একটু এলাম। খুব ব্যস্ত নাকি? মনোরম বলে।

—একটু, বলে সমীর চেয়ারে হেলান দিয়ে আঙুলে মাথার চুল পাট করতে করতে বলল—সাড়ে চারটেয় কিক্ অফ্। ভাবছিলাম তাড়াতাড়ি কাজটাজ চুকিয়ে একটু মাঠে যাবো। বলে ঘড়ি দেখে সমীর বলে—ঠিক আছে, তুমি বোসো। খানিকক্ষণ সময় আছে।

বীয়ারটা এখনো পেটে, ঘাম বা পেচ্ছাপের সঙ্গে এখনো পুরোটা বেরিয়ে যায়নি। মনোরম চেয়ার টেনে বসে হিসেব করে নিচ্ছিল, এতবড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলটা পার হয়ে সমীরের নাকে অ্যালকোহলের গন্ধটা যাচ্ছে কিনা। টেবিলের ওপর হেলাভরে পড়ে আছে এক প্যাকেট বেনসন আব হেজেস, ছোট্ট দেশলাই। মনোরম প্যাকেটটা টেনে সিগারেট ধরাল। সমীর লক্ষ্য না-করার ভান করে নীচু হয়ে একটা ড্রয়াব টেনে কী একটু দেখতে লাগল কাগজপত্র।

দামী সিগারেট, কিন্তু বীয়ারের পেটে কোনো ভাল গন্ধ পাওয়া মুশকিল। মনোরম যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করল গীতাদি ভাল?

—ভালই। একটা বাচ্চা হয়েছে জানো তো! ছেলে।

—না।

—সাড়ে তিন কেজি। রুমী ভাই পেয়ে খুব খুশী। দিন রাত বেবালের মতো থাবা গেড়ে ভাইয়ের মুখের ওপর ঝুঁকে বসে আছে।

বলে এবার সত্যিকারের খুশীর হাসি হাসল সমীর। মেয়ে রুমার পর দশবছর বাদে ওদেব ছেলে হ'ল। খুশী হওয়ারই কথা।

মনোরম যান্ত্রিক এবং অন্যমনস্ক গলায় বলে—কংগ্র্যাচুলেশনস।

সমীর মাথার চুলে মুদ্রাদোষবশত আঙুল চালাতে চালাতে বলে—একটু বেশী বয়সে হ'ল. ঠিকমতো মানুষ করে যেতে

পারবো কিনা কে জানে !

সমীরের গলার স্বরটা ভারী এবং পরিষ্কার। একেই কি বাস্ ভয়েস বলে ? এত ভদ্র এবং মাজা গলা যেন মনে হয় খুব উঁচু থেকে আসছে। এত শিক্ষিত ও ভদ্র গলায় কখনো কোনো অশ্লীল কথা বলা যায় না। সমীর বোধহয় তার বউকেও কখনো কোনো অশ্লীল কথা বলেনি, যা সবাই বলে ! সীতাকে অনেক অশ্লীল কথা শিখিয়েছিল মনোরম, সীতা শুনে দুহাতে মুখ ঢেকে হাসতে হাসতে বলত—মাগো ! পরে দু'একটা ঐসব খারাপ কথা সীতাও বলত। ঠিক সুরে বা উচ্চারণে বলতে পারত না। তখন মনোরম হাসত। এবং ঠিক উচ্চারণটা আর সুরটা শেখাত। সীতা শিখতে চাইত না। সমীর আর গীতা কি অন্তরঙ্গ প্রবল সব মুহূর্তে ওরকম কিছু বলে ? বোধহয় না। ওদের রক্ত অনেক উঁচু জাতের।

মনোরম সমীরের নম্র এবং সুন্দর কমনীয় মুখটির দিকে চেয়ে থেকে বলল—মানুষ করবার ভার আপনার ওপর নয়। টাকার ওপর। একটা হেভী ইন্সিওরেন্স করিয়ে রাখুন।

সামান্য একটু গম্ভীর হয়ে গেল সমীর। কিন্তু কথাটা গায়ে মাখল না। ডজ্ করে বেরিয়ে গেল। বলল—তার অবশ্য দরকার হবে না। যা আছে···বলে একটু দ্বিধাভরে থেমে থাকল। এত ভদ্র সমীর যে, টাকার কথাটা মুখে আনতে পারল না। মনোরমেরই ভুল। সমীররা তিন পুরুষের বড়লোক। ওর এক ভাই আমেরিকার হিউসটনে আছে, বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা মাইনে পায়, অন্য ভাই ফিল্ম প্রডিউসার। সমীর নিজে বিলেতফেরত অ্যাকাউন্ট্যান্ট্। সীতাদের পরিবারের উপযুক্ত জামাই। এসব প্রায় ভুলেই গিয়েছিল মনোরম। প্রায় একবছর সীতাদের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। তেমনি চুলে আঙুল চালিয়ে সমীর বলে—তবে ছেলেকে মানুষ হতে দেখে যাওয়াটা বাপের একটা স্যাটিস্-ফ্যাকশন।

মুখে কোনো বিরক্তির চিহ্ন নেই, তবু সমীরের বিরক্তিটা টের পাচ্ছিল মনোরম। ওর চোখ মনোরমের লম্বা চুল, বড় জুলপী আর কাজকরা পাঞ্জাবির ওপর থেমে থেমে সরে গেল। বোধহয় মনে মনে পোশাকটাকে সমীর পছন্দ করল না। কিন্তু কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কথা বলা সমীরের স্বভাব নয়। অভিজাতদের এইসব সুশিক্ষা থাকেই।

সমীর চোরাচোখে ঘড়িটা একবার দেখে নিল, বলল—তোমার কি কিছু বলার ছিল?

মনোরম মাথা নেড়ে বলল—না। একটু বসব বলে এসেছিলাম। বাইরে যা বৃষ্টি!

—বৃষ্টি! চোখ বড় করে বলে সমীর, তারপর একটু লাজুক হাসি হেসে বলে—বাইরের রোদ বা বৃষ্টি এখানে বসে কিছু বোঝা যায় না। তারপর একটু চিন্তিতভাবে বলে—খুব বৃষ্টি?

—থেমেছিল। আবার বোধহয় শুরু হয়েছে।

অন্যমনস্কভাবে সমীর বলে—খেলাটা না ওয়াশড্ আউট হয়ে যায়!

—কার খেলা?

—ছোটবাঙাল আর বড়বাঙাল। উয়াড়ি ভারসাস ইস্টবেঙ্গল। সমীর তার সরু কিন্তু সুবিন্যস্ত দাঁত আর কোমল ঠোঁট দিয়ে আকর্ষক হাসিটা হাসে, তারপর ফোনটা তুলে নিতে নিতে বলে—দাঁড়াও, জেনে নিই।

ফোন করল। বোধহয় ক্লাবে। সমীর অনেক ক্লাবের মেম্বার। আই-এফ-এ, সি-এ-বি, ওয়াই-এম-সি-এ এবং আরো কয়েকটার। বোধহয় রোটারিয়ানও। বহুকাল ধরে মেম্বার। এতদিনে দু'চারটে ক্লাবের কর্মকর্তাও হয়েছে বোধহয়।

ফোনটা নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে বলল—না, খেলা হচ্ছে। বৃষ্টিটা বোধহয় থেমে গেল। লীগের যা অবস্থা আজকের খেলাটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট।

থুঁতনিই বোধহয় মানুষের মুখের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। অনেকক্ষণ সমীরকে লক্ষ্য করে এই সত্যটা উপলব্ধি করে মনোরম। থুতনির চমৎকার খাঁজটি সমীরের বংশগত, ঐ খাঁজটিই ওর মুখটাকে এত উঁচুদরের মানুষের মুখের মতো করেছে। অনেক মানুষের মুখই সুন্দর কিন্তু সেই সৌন্দর্যে সব সময়ে ব্যক্তিত্ব থাকে না। সমীরকে দেখলেই যে সম্ভ্রান্ত এবং উঁচুদরের লোক বলে মনে হয় তা কি ওর চমৎকার খাঁজওলা ঐ থুঁতনিটার জন্যই? মনোরম ভাবে। সমীর ঘড়ি দেখছে। বোধহয় প্রায় চারটে বাজে। ওর ওঠা দরকার। কিন্তু সে কথাটা ভদ্রতাবশত মনোরমকে বলতে পারছে না।

মনোরম সঙ্কোচটা ঝেড়ে ফেলে বলে—সীতার কোনো খবর জানেন?

আবার মদরঙের চশমার ভিতরে চোখটা সামান্য বিস্ফারিত হল। বিস্ময়ে। একটু অস্বস্তির সঙ্গে সমীর বলে—সীতা! ভালই আছে। একদিন কি দু'দিন নার্সিং হোম-এ গিয়েছিল ওর দিদিকে দেখতে।

—সে খবর নয়, অন্য কোনো খবর?

—আর কী? ওদের বাড়িতে বহুদিন যাই না, ঠিক কিছু বলতে পারব না। কিসের খবর চাও?

মনোরম টেবিলের ওপর কাচের ভিতরে চাপা একটা ছবি দেখল। রঙীন ফটোগ্রাফ বলে মনে হয়েছিল প্রথমে। তা নয়, হাতে আঁকা রঙীন প্রিন্ট। বনভূমিতে বেলাশেষের সিঁদুরে আলো, কয়েকটা গরুর গাড়ি ঝুঁকে আছে, মাঝখানে আদিবাসী কয়েকজন নারী ও পুরুষ রান্নাবান্না করছে। পথের ওপর গেরস্থালি। ছবিটার মধ্যে একটা গল্প আছে।

সে মুখ তুলে বলল—একটু আগে আমি সীতাকে দেখলাম।

সমীর অস্বস্তিতে চেয়ারের একদিক থেকে আর একদিকে শরীরের ভর দিল। বলল—ও! কোথায়?

—এসপ্লানেডে। বোধহয় মার্কেটিংয়ে এসেছিল। ফিরে যাচ্ছিল তখন।

চুলে তেমনি আঙুল চালায় সমীর। চোখ সরিয়ে নেয় মনোরমের চোখ থেকে, তারপর একটু হালকা গলায় বলে—কথা-টথা বললে নাকি ?

—না। আমি কথা বললেও ও পাত্তা দিত না।

মনোরম ক্ষীণ একটু হাসে। সমীর চিন্তিতমুখে পার্টিশনটার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বড় একটা শ্বাস ফেলে বলে—আর কিছু বলবে ? হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বলে—এখনো একটু সময় আছে।

—কটা বাজে ?

—চারটে প্রায়।

—আমার কিছু বলার ছিল।

—খুব কি জরুরী কথা ?

—খুব। অন্তত আমার কাছে।

—খুব জরুরী হলে না হয় আজকের প্রোগ্রামটা

—না না। আমি আমার খুব অল্প কথা।

সমীর একটু ঝুঁকে মুখখানা তুলে চেয়ে রইল।

মনোরম বলার আগে আর একবার বনভূমির ছবিটা দেখে নিল। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে কয়েকটা গরুর গাড়ি। গাছের ছায়ায় গোল হয়ে আদিবাসী নারী ও পুরুষ উনুন জ্বেলেছে।

আমি আজ সীতাকে দেখলাম।

—বলেছো তো।

—বলেছি। তবু বলতে ইচ্ছে করছে।

—বল ?

—সীতা এরপর কী করবে কিছু জানেন ?

—ফ্র্যাঙ্কলি জানি না।

সমীর দুঃখিতভাবে তার দিকে চেয়ে থাকে। মুখে সত্যিকারের

সমবেদনা। রক্তাভ সুন্দর আঙুল দিয়ে থুতনির খাঁজটা মুছে নিল অকারণ। একটা পোখরাজ একটু ঝলসে যায়। মনোরম বুঝতে পারে, সমীরের কিছু বলার নেই।

কিন্তু তবু মনোরমের ইচ্ছে হয়, আরো একটুক্ষণ এই সফল সুপুরুষ ও উঁচু দরের লোকটির সঙ্গে কাটায়। তাকে একটু দেখতে ইচ্ছে করে, কী আছে লোকটার। সাধারণ কথা একটু শুনতেও ইচ্ছে করছিল তার।

সে একটা মিছে কথা বলল। চেয়ারটা ছেড়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল—আমিও মাঠের দিকে যাচ্ছিলাম।

যাবেন? বলে একটু বিস্মিতভাবে তাকিয়েই সেই ভদ্র আন্তরিক হাসিটি হেসে বলে—ইউ আর ওয়েলকাম। আমার সঙ্গে চলো।

টেবিলের ওপার থেকে মনোরম বলে—যাবো?

—যাবে না কেন?

মনোরম একটু বোকা-হাসি হেসে বলে—আমি আজ একটু মদ্যপান করেছি। অবশ্য তেমন কিছু না, একটু বাধাব…

তেমনি ভদ্র হাসি হেসে সমীর উঠতে উঠতে বলে—গন্ধ পাচ্ছিলাম। তাতে কী? আমিও তো মাঝে মাঝে খাই। ইটস অল ইন দ্য গেম।

টেবিল থেকে চোখ সরিয়ে নেওয়ার আগে শেষবারের মতো মনোরম ছবিটা দেখছিল। বাঁকা আলোর বনভূমিতে গোরু-গাড়ি থামিয়ে গেরস্থালি পেতেছে কয়েকজন আদিবাসী পুরুষ ও রমণী। কী চমৎকার বিষয়, যেন ঠিক একটা গল্প বলা আছে ছবির ভিতরে। ছবিটা দেখতে দেখতেই সমীরের শেষ বাক্যটির চমৎকার ইংরিজি কটা শব্দ শুনে সে চমকে গেল। এখনো ভাল ইংরিজি বলা লোককে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হয়। আদিবাসীদের ছবি থেকে সে চোখ সরিয়ে কলকাতায় চলে এল এক পলকে। কিছুক্ষণের জন্য যেন বা সে ঐ ছবির বনভূমিতে চলে গিয়েছিল।

একটু হস্টাইল।

সাধারণ দর্শকদের গ্যালারি থেকে যখন মানুষ জামা প্যান্ট খুলে বাতাসে ওড়ায়, চেঁচিয়ে বাপ-মা তুলে গাল দেয় খেলোয়াড়কে, যখন ঘাড়ে লাফিয়ে ওঠে, মস্তিষ্কশূন্য খ্যা-খ্যা হাসে, কনুয়ের বা হাঁটুর গুঁতো দেয়, তখন তার মাঝখানে এই অতি সুকুমার ও ভদ্র মানুষটিকে কেমন দেখাবে? যখন ইট ছুঁড়ে মারবে, রেফারী, লাইন্সম্যান আর ক্লাবের কর্মকর্তাদের পিতৃপুরুষ উদ্ধার করবে তখন কেমন হবে ঐ মুখখানার ভাব!

—ওরা হস্টাইল কেন, তা কিন্তু একবার আপনার নিজের দেখে আসা উচিত। গভর্নিং বডির মেম্বারদের দর্শক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা ভাল।

সমীর দ্বিধাভরে বলে—মন্দ বলোনি। কিন্তু এ বয়সে একটা মোটামুটি ভদ্র জীবন যাপন করে, ঐ ইট-ছোড়া আর খারাপ কথা ভাল লাগে না। হার্শনেসটা ঠিক সহ্য হয় না আমার।

মাঠের কাছাকাছি এসে মনোরম হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সমীরের কোমল, পরিষ্কার এবং রক্তাভ একখানা হাত ধরে—আসুন।

সমীর অবাক হয়ে বলে—কোথায়?

—সবুজ গ্যালারিতে।

—আরে পাগল, টিম মাঠে নামবে, মেম্বাররা খোঁজাখুঁজি করবে।

মনোরম মিনতি করে—আসুন না। একদিন আমার সঙ্গে দেখুন। ওদের বলবেন শরীর খারাপ ছিল।

সমীর হাত টানাটানি করল না, বিরক্তি দেখাল না। কেবল সহৃদয়ভাবে হেসে বলল—আরে, আজ তুমি আমার গেস্ট্। এসো, এসো···

লড়াইটা মর্যাদার ছিল! সবুজ গ্যালারিতে লম্বা লাইনে সমীরকে দাঁড় করাবে, গ্যালারিতে খিস্তির সমুদ্রে দাঁড় করিয়ে পাশাপাশি খেলা দেখবে—এতটা আশা করেনি মনোরম। বড়-লোকেরা যে কী জিনিস দিয়ে তৈরী! টপ্ করে হারিয়ে দেয়।

মনোরম ঐ মহার্ঘ গলার স্বরের প্রভুত্বের কাছে হেরে গেল। খুবই বোকা-বোকা লাগছিল নিজেকে।

সমীর তার কাঁধটা বন্ধুর মতো ধরে বলল—চলো।

মনোরম চলল। সসম্ভ্রমে গেট-এর পাহারাদাররা রাস্তা ছেড়ে দেয়। মনোরমকে সে প্রশ্নই করে না।

ভিতরে দু'চারজন কর্তাব্যক্তি গোছের লোক সমীরকে ঘিরে ধরে। সমীর যে বড় 'ডোনার' এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, নইলে মনোরমের সন্দেহ ও কোনোকালে ফুটবলে লাথিই দেয়নি।

কথা বলতে বলতেই সমীর ব্যস্তভাবে চলে গেল টেন্ট-এর দিকে, মনোরম যে সঙ্গে আছে, খেয়ালই করল না। একা দাঁড়িয়ে থেকে মনোরম তার নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠে। একা সে দাঁড়িয়ে, চারদিকে ব্যস্ত সমস্ত লোকজন চলে যাচ্ছে। এখন কেউ তাকে সে কে জিজ্ঞেস করলে তার কোনো কিছু বলার নেই। চলাচলের রাস্তাটা ছেড়ে সে গ্যালারির তলদেশে আবডালায় এসে দাঁড়ায়। টেন্ট-এর খোলা জানালা দিয়ে ভিতরের অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। সমীর যে কোথায় গেল! বড্ড একা লাগে মনোরমের। আর সেই নিঃসঙ্গতায় কেমন টিক্ টিক্ করে মুখের ভিতরে নড়ে তার অসহায় জিভখানা।

ঝলসানো রঙের জার্সিপরা খেলোয়াড়রা সারিবদ্ধভাবে টেন্ট থেকে বেরিয়ে আসছে। কী চমৎকার তাদের সাজ! উঁচু, নোয়ানো নিস্ক গর্বিত মাথা, চারদিককে অবহেলা করে • । পলকে গ্যালারির ভিতরকার রাস্তা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় মাঠের দিকে। সামনে পেছনে পাশে কয়েকজন ভাল চেহারার লোকজন তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে গেল। মনোরম ঈর্ষার চোখে ওই তাজা বয়সী খেলোয়াড়দের চলে-যাওয়া দেখছিল। সে যদি খেলোয়াড় হত!

আলো থেকে চোখ সরিয়ে গ্যালারির তলার আবছায়ার

দিকে তাকিয়ে মনোরম নিজেকে দেখতে পাচ্ছিল। পায়ে বুট, হোস, আর রঙীন জার্সি। নোয়ানো মাথা, আত্মবিশ্বাসী সতেজ উরুদ্বয়ে মাংসল শক্তির পিচ্ছিলতা। হেঁটে যাচ্ছে মনোরম খেলার মাঠের দিকে। সেখানে হাড়ভাঙা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। গ্যালারিতে সীতা বসে আছে, উদগ্রীব তার শুষ্ক উজ্জ্বল মুখখানা। মাঠে বাইশজনের একজন হয়ে মনোরম প্রচণ্ড শক্তিতে ফেটে পড়ে। কী খেলাই খেলছে মনোরম, কী খেলাই যে খেলছে! বাইশ-জনের মধ্যে ঠিক একজনকেই দেখছে সীতা। মনোরমকে।

হঠাৎ মাঠে চিৎকার ফেটে পড়ে। টিম মাঠে নামছে। কল্পনাটা ভেঙে যায়।

মাঠ থেকে চিৎকার আসছে। বলে বুটে লাগাবার শব্দ। দৌড় পায়ের আওয়াজ। একজন চেঁচিয়ে উঠল—হেগো···হলদে চিনি দিয়ে খা। একা বিষণ্ণ এবং চুপচাপ দাঁড়িয়ে শোনে মনোরম। আজ বিকেলে সে সীতাকে দেখেছিল। ভুলতে পারছে না।

শেষ পর্যন্ত স্মৃতি ছাড়া মানুষের কিছুই থাকে না বুঝি. গ্যালারিতে ঝুঁকে মানুষ খেলা দেখছে, মাঠে বগ-ছেঁড়া লড়াই কত উত্তেজক, বলে পা লাগার শব্দ কী মাদকতাময় কত মানুষের কাছে! একাকী মনোরম দাঁড়িয়ে আছে গ্যালারির ছায়ায়, বিষণ্ণ, স্মৃতিতাড়িত, উদাসীন। এখনো, মানুষ পৃথিবীতে খেলা করে। ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার সেটা। চারদিকে বৃষ্টিবিন্দুর মুক্তো আর মেঘভাঙা রোদের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর মাটিতেই হেঁটে গেছে সীতা। কোথা থেকে এসেছিল, কোথায় চলে গেল কে জানে! প্রায় এক বছরে সীতা কত দূরের হয়ে গেছে! সীতাকে চেনার চিহ্নগুলি কি শেষ পর্যন্ত মনোরমের থাকবে। ভুলে যাবে না তো! স্মৃতি ছাড়া তার আর কিছুই নেই। প্রবল বৃষ্টিতে যেমন গাছপালার ধুলোময়লা ধুয়ে যায় তেমনই কি সীতা মনোরমের সব স্মৃতি ধুয়ে-মুছে ফেলেছে? কিছু কি নেই?

মুখের ভিতরে জিভটা নড়ছে টুক টুক করে। চামচের মতো

নড়ন্ত জিভটাই যেন তার স্মৃতিকে ঘুলিয়ে তোলে। সীতা তীব্র আশ্লেষের সময়ে কতবার তার সুন্দর দাঁতে মুখের ভিতরে মনোরমের জিভটাকে নরম করে চেপে ধরে রেখেছে। শ্বাসবায়ুর স্বরে বলেছে 'নোড়ো না, নোড়ো না জিভ, চুপ করো।' সীতার সুগন্ধী সুস্বাদু মুখের ভিতরে জিভটা নিথর হয়ে থাকত। এমন প্রবলভাবে সেই অনুভূতিটা আক্রমণ করে মনোরমকে যে তার চোখ বুজে আসে, মুখটা আস্তে একটু ফাঁক হয়, জিভটা লোভ-প্রত্যাশায় বেরিয়ে আসে। মুখে স্বেদবিন্দু ফুটে ওঠে মনোরমের, গায়ে কাঁটা দেয়, শ্বাস গাঢ় হয়ে আসে। সমস্ত শরীরটা এক অদৃশ্য সীতার ঝুঁকে-পড়া, কাছে-আসা, আলিঙ্গন-আশ্লেষে বদ্ধ অস্তিত্বের স্বাদ নিতে থাকে। ইডিও-মোটর অ্যাকশন।

ঠিক এই অবস্থায় তাকে দেখল সমীর। টেণ্ট এর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবার মুখে দরজায় দাঁড়িয়ে সে অবাক হয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। কাছে এসে বলল—তোমার শরীর কি খারাপ মনে হয়?

—না, না। লজ্জা পেয়ে মনোরম বলে।

সমীরের অবাক ভাবটা কাটেনি, বলল চোখ বুজে, 'হঠাৎ কেন রে এমনভাবে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলে যে আমি ভয় পেয়েছিলাম।'

কী করবে মনোরম। মনে পড়ে, বড় যে মনে পড়ে! কিন্তু একটা প্রবলভাবে মনে পড়লেই তার ইডিও-মোটর অ্যাকশন হতে থাকে। এই ইংরিজি শব্দটা সীতাই শিখিয়েছিল তাকে। ছুঁচে সুতো পরাচ্ছে সীতা, অখণ্ড মনোযোগে, খুব ধীর হাতে, চোখ ছোটো, ঠোঁট দুটো পাখির ঠোঁটের মতো ছুঁচোলো। সেইদিকে দেখতে মনোরমেরও চোখ ছোট হয়ে যেত, ঠোঁট ছুঁচোলো হয়ে আসত, দুটো হাত আপনা থেকেই শূন্যে উঠে ছুঁচে সুতো পরানোর ভঙ্গিতে স্থির হয়ে থাকত, হঠাৎ চোখ তুলে দৃশ্যটা দেখেই হেসে ফেলে সীতা একদিন বলেছিল—তোমার

যায়। লোহার ঘেরা-বেড়ার গেট দিয়ে মাঠের সাইড লাইনের ধারে গিয়ে বসে। একটা প্রবল চিৎকার উঠতে উঠতে হঠাৎ ফেটে পড়ে উল্লাসে। গোল। দু'হাতে কান ঢেকে মনোরম চোখ বুজে থাকে কিছুক্ষণ। এত কোলাহল তার সীতার হেঁটে-যাওয়ার ছবিটা ছিঁড়ে দেয় বুঝি!

সমীর গাঢ় একটা শ্বাস ফেলে সিগারেট ধরাল। মুখে হাসি। একটু ঝুঁকে বলল—বি পাল খেলছে না, আমাদের রেগুলার স্ট্রাইকার। খুব চিন্তা ছিল।

না-বুঝে মনোরম হাসল, যেন বা গোলটা হওয়ায় সেও নিশ্চিন্ত। খানিকটা অসহায়ভাবেই সে মাঠের দিকে চেয়ে খেলাটা বুঝবার চেষ্টা করে। সারা মাঠ জুড়ে রঙীন জার্সির ছোটাছুটি। মাঠে চোরা জল লাথি খেয়ে হঠাৎ ছিটকে ওঠে ফোয়ারার মতো। পিছলে পড়ে বহু দূর মাটিতে ঘষটে যায় চতুর খেলোয়াড়েরা। কী সুন্দর ভঙ্গীতে হরিণের মতো লাফিয়ে ওঠে শূন্যে গোলমুখে কয়েকজন হালকা শরীরের মানুষ। বলটা বাতাসে কেমন ধনুকের মতো বাঁক নেয়। দেখতে দেখতে তার ইডিও-মোটর অ্যাকশন হতে থাকে। পা শূন্যে ওঠে, মাথাটা হঠাৎ নড়ে, দু' হাত মুঠো পাকায়।

দুটো গোলের পর সমীর হাসল—গেম ইজ ইন দি পকেট। তুমি কি বলবে বলেছিলে মনোরম!

মনোরম একটু ইতস্তত করে। তারপর বলে—মানস লাহিড়ীকে আপনি চেনেন?

সমীর একটু থমকায়। তারপর চিন্তা করে বলে…কোন মানস বলো তো!

—জিমন্যাস্ট ছিল। রিং থেকে পড়ে গিয়ে যার কলারবোন ভেঙেছিল। এখন রেলের অফিসার, দু'-চারটে ক্লাবের কোচ চেনেন না?

সমীর মাথা নাড়ল, বলল—হ্যাঁ, চিনি।

—আমি খবর রাখি, সীতা ওকে বিয়ে করবে।

সমীর নীরবে কিছুক্ষণ খেলাটা দেখে যেতে থাকল। ভ্রূ কোঁচকালো। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বলল—মনোরম, ব্যাক্তিগত আমি কিছুই জানি না। কিন্তু যদি সীতা আবার বিয়ে করেই, তাতেই বা কী?

মনোরম সহজ উত্তর দিল না। বলল—ডিভোর্সের পর এক বছর পূর্ণ হতে আর মাস তিনেক বাকি। তারপর আইনত সীতা বিয়ে করতে পারে। কিন্তু—

—কিন্তু কী?

—আমার কয়েকটা কথা ছিল।

সমীরের ভ্রূ কোঁচকানোই ছিল, একটু অধৈর্যের গলায় বলে—আমাকে এসব ব্যাপারের মধ্যে টেনো না মনোরম। আমি ইনভলভড হতে চাই না। তাছাড়া সীতার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক তো চুকেই গেছে। আবার কেন? লীভ হার অ্যালোন।

মনোরম মাথা নাড়ল। বলল—তা হয় না। সীতা এখনো আমার কাছ থেকে মাসোহারা পায়।

—তাতে কী?

—তাতে এটুকু প্রমাণ হয় যে, সে আমার ওপর এখনো কিছুটা নির্ভরশীল। নীতিগতভাবে তার সম্বন্ধে দু-চারটে কথা আমি বললে দোষ হয় না।

—কিন্তু আমাকে কেন জড়াচ্ছো?

—আপনাকে জড়াচ্ছি না। সীতার কোনো খবর পাওয়ার উপায় আমার নেই। আপনি ও-বাড়ির জামাই, আপনি খবর পান। তাই আপনাকে ছাড়া আর উপায় কী?

—তুমি বরং সীতাকে চিঠি লেখো, কিংবা টেলিফোন করো।

—টেলিফোন করলে ও ফোন রেখে দেবে, চিঠি ছিঁড়ে ফেলবে।

সমীরের ভদ্র ও সুকুমার মুখে ইতিমধ্যে অধৈর্যের ভাব ফুটে

উঠেছে। মনোরম সেটা লক্ষ্য করে। তবু সমীর বলে—কী বলতে চাও?

গোলের সামনে একজন ফরোয়ার্ড ল্যাং খেয়ে মাটিতে গড়াচ্ছে। চারদিক থেকে প্রবল একটা চিৎকার ওঠে। রেফারীর বাঁশি বাজে। সমীর হঠাৎ দু' হাতে মাথাটা ধরে ধরা গলায় চেঁচিয়ে বলে—গড! পেনাল্টি।

স্পটে বল বসানো হয়েছে। কিন্তু কে কিক নেবে তা নিয়ে একটু ঠেলাঠেলি হতে থাকে। কেউ এগোয় না। মাঠসুদ্ধ লোক ঝুঁকে আছে ব্যাপারটার দিকে। সমীর নিথর। কথাগুলো আটকে আছে মনোরমের গলায়। পেনাল্টি শটটা নিতে ওরা বড় দেরি করতে থাকে। মনোরমের ইচ্ছে করে, উঠে গিয়ে শটটা দিয়ে ফিরে এসে সমীরকে কথাগুলো বলে।

কালো লম্বা একটা ছেলে অবশেষে এগিয়ে যায়। কোমরে হাত দিয়ে হাত দশেক দূর থেকে বলটাকে দেখে। দৌড়োয়, এবং ডান পায়ে বিকট কিক নেয়। কোমর সমান উঁচু হয়ে গোলকীপারের ঢাক ঢেকে বলটা গোলে ঢুকে যায়। মাঠ স্তব্ধ।

সেই স্তব্ধতার মধ্যেই মাঠের মাঝখানে বলটা চলে আসে। দু'পাশে খেলোয়াড়রা দাঁড়ায় যথাযথ। সমীর অস্ফুট গলায় বলে—গড।

তারপর সিগারেট ধরায়।

মোটে আর একটা গোলের লীড থাকছে। হাফটাইম পর্যন্ত ব্যাপারটা যথেষ্ট নিরাপদ নয়। মনোরম সমীরের মুখ দেখে ব্যাপারটা আঁচ করে নি।

চিন্তিত সমীর মনোরমের দিকে মুখ ফেরায় এবং স্বয়ংক্রিয় হাতে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই এগিয়ে দেয়।

—কী বলছিলে যেন।

মনোরম একটা শ্বাস ফেলে বলে—সীতার কথা।

—ও। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো।

—আসলে সীতার কথাও আমি বলতে চাইছি না।

—তবে কী বলতে চাইছো ?

—স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের কথা।

—বলো।

—মানস লাহিড়ী আমার বন্ধু ছিল. আমাদের বাসায় আসত-টাসত। এবং নামকরা জিমন্যাস্ট বলে আমি তাকে যথেষ্ট খাতির করতাম। সে সীতার খুব প্রশংসা করত। ক্রমে সীতার ভাল লাগতে থাকে। মানস লাহিড়ীকে তো আপনি জানেন, কী রকম পেটা প্রকাণ্ড শরীর, কাঁধের হাড় ভাঙা বলে বাঁ দিকটা একটু বেঁকে থাকে, তবু খুবই পুরুষালী চেহারা। অন্য দিকে সীতা একটা চড়াই পাখির মতো ছোট্ট আর নরম আর সুন্দর।

—গুডনেস্! সমীর আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে।

ও বিরক্ত হয়েছে মনে করে মনোরম থেমে যায়। কিন্তু তারপরই দেখে কর্নার ফ্ল্যাগের কাছ পর্যন্ত গিয়ে সমীরের প্রিয়তম রাইট-আউট বলটা সেন্টার করতে পারেনি। বল লাইন পার হয়ে গেছে। গোল কিক।

—কী বলছিলে যেন ?

—স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের কথা।

—বলো।

-কোনো অন্য পুরুষ যখন কোনো বিবাহিতা মহিলার প্রশংসা শুরু করে এবং সেই মহিলা যখন সেই প্রশংসা গ্রহণ করে খুশী হতে থাকে তখন তাদের মধ্যে একটা যৌন ঋণ গড়ে ওঠে।

—কিসের ঋণ ?

—যৌন ঋণ।

—ওঃ গড !

পেনাল্টি বক্সের মাথা থেকে একজন খেলোয়াড় বলটা বাইরে মেরেছে। মনোরম গভীরভাবে সিগারেটে টান দেয়। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে।

—কী বলছিলে মনোরম ? কিসের ঋণ ?

—যৌন ঋণ।

—সেটা কী ব্যাপার ?

—পরস্পরের কাছে তখন একটা না-বলা দাবি-দাওয়া তৈরী হতে থাকে। অপরিশোধ্য একটা ঋণ গড়ে ওঠে। ঠিক ভালবাসা এ নয়, এটুকুর জন্য কেউ ঘর-সংসার ভাঙে না, তবু এও এক ধরনের স্খলন বা পতন। পরস্পরকে যখনই ভাল লাগতে থাকে, তখনই ভিতরে ভিতরে একটা বাঁধ ভাঙার ইচ্ছে উঁকি দিতে থাকে। যেহেতু সেটা অবৈধ সেই জন্যই সেটা আরো মারাত্মক হয়ে ওঠে।

—ডিসগাস্টিং। বি পাল খেললে এরকমটা হত না।

—কার কথা বলছেন ?

—বি পাল। আমাদের স্ট্রাইকার। গোল-লাইন থেকে বলটা ব্যাক করতে পারা ছেলেখেলা ছিল, মজুমদার পারল না দেখলে ?

—আমি মানস লাহিড়ীর কথা বলছিলাম।

—ওঃ হ্যাঁ, বলো।

—আসলে মানস লাহিড়ীর কথাও নয়।

—তবে কার কথা ?

—স্বামী-স্ত্রীর কথা।

—বলো।

—বিয়ের ছয়-সাত বছর পর আর পরস্পরকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর তেমন উত্তেজনা থাকে না।

—বটেই তো।

—সীতার আর আমারও ছিল না।

—হুঁ, হুঁ।

—আর তখন মানস লাহিড়ী আসত।

—ঠিক।

—আর তখন আমরা যখন, অর্থাৎ আমি আর সীতা যখন

শারীরিক দিক দিয়ে মিলিত হতাম, মানে—বুঝতেই পারছেন—

—ও-গুড-নেস্—

সমারের টিম অন্য টিমের গোলপোস্ট চেকে ধরেছে। পর পর চারজন গোলে মারল। পোস্ট, বার, খেলোয়াড়ের গা থেকে ফিরে এল। শেষ শটটা গোলকীপার উড়িয়ে দিল বারের ওপর দিয়ে। কর্নার।

কর্নার কিকটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে মনোরম।

কিক থেকে একটা নিষ্ফলা হেড। তারপর গোল-কিক আবার।

শ্বাস ফেলে সমার বলল—বলো।

—যখন আমরা মিলিত হতাম মানে শারীরিক ভাবে, বরলেন ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো।

—তখন আমার প্রায়ই মনে হত সীতা আমার কথা ভাবছে না।

—তবে কার কথা ?

—মনে হতো, সীতা চোখ বুজে আমার জায়গায় আর একজনকে ভেবে নিচ্ছে এবং তাতে তার সমস্ত শরীরে একটা বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। মনে মনে সে তখন সেই ঋণ শোধ দিচ্ছে।

—মাই গুডনেস্! সমার চাপা তীব্র গলায় বলে।

মনোরম চমকে মাঠের দিকে তাকাল। না, মাঠে কোনো ঘটনা ঘটেনি। মাঝ-মাঠে একজন বল নিয়ে ডুবল পাশে দৌড়াচ্ছে। বেরোতে পারবে না।

সমার তার দিকেই তাকিয়ে আছে। মনোরম লজ্জা পায়।

—কী বলছো মনোরম ?

—আমার ওরকম মনে হতো।

—কেন ?

—মনে হওয়াকে কেউ ঠেকাতে পারে না।

সমীর দ্রুত সিগারেটে টান দেয়। বলে—তারপর ?

মনোরম দুঃখিত গলায় বলে—আমার একটা দোষ, আমি বড্ড বেশী কৌতূহলী। সব ব্যাপারটা আমি জানতে চাই। তাই সীতাকে আমি জিজ্ঞেস করি। মানস লাহিড়ীকেও।

—বলো কী ?

মনোরম ম্লান একটু হাসল। বলল—দু'জনেই অস্বীকার করেছিল। কিন্তু আমি জানতাম ওরা মিছে কথা বলছে। কিন্তু ব্যাপারটা আমার পক্ষে কী রকম কঠিন হয়ে দাঁড়াল ভেবে দেখুন। আমি সীতার স্বামী, তার সঙ্গে মিলিত হচ্ছি, সম্পূর্ণ বৈধ ভাবে। অথচ জানছি, আমি নই, তার বুক জুড়ে আর একজনের কাছে ঋণ। আমি সেই আর একজনের প্রতিনিধি হয়ে সেই ঋণ শোধ নিচ্ছি মাত্র। এভাবেই আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ক্রমে অবৈধ হয়ে ওঠে।

সমীরের মুখের সুকুমার ভাবটুকু ভেদ করে একটা বিদ্রূপের ভাব ফুটে ওঠে। সে বলল—ফিলসফিক্যাল। এসব কী বলছো মনোরম !

—আমি সীতা বা মানসের কথা বলতে চাইছি না। আমি আসল জানতে চাইছি সব স্বামী-স্ত্রীরাই কি এরকম হয় ? এরকম হওয়াটাই কি স্বাভাবিক ?

—নিশ্চয়ই নয়।

—আপনি কখনো সীতাদিকে জিজ্ঞেস করেছেন ?

—কী ?

—তিনি কখনো আর কাউকে

পলকে ফণা তোলে সমীর। দু'খানা চোখ ঝক ঝক করে ওঠে। মনোরম মুখ আড়াল করে উদ্যত হাতে, যেন বা মার ঠেকাবে।

—রিডিকুলাস মনোরম ! ভেরী রিডিকুলাস। তুমি কি পাগল ?

মনোরম অবাক হয়ে টের পায়, সমীরের টিম একটা গোল দিয়েছে। ৩—১। সমস্ত মাঠ ফেটে পড়ছে উল্লাসে। সবুজ গ্যালারির ওপর শূন্যে ভাসছে ছাতা, উড়ছে জুতো, জামা। সমীর এক পলক তাকিয়ে দেখল মাত্র। উত্তেজিত হলো না।

মনোরম আস্তে বলল—আমার যন্ত্রণাটা ঠিক এইভাবে শুরু হয়। অথচ কখনো সীতা বা মানস লাহিড়ী পরস্পরের দিকে এক পাও এগোয়নি। বৈঠকখানা ঘরে তারা বরাবরের মতো দুটো দূরের চেয়ারে বসে থেকেছে, হেসেছে, স্বাভাবিক কথাবার্তা বলেছে। কিন্তু আমি কেন—আমারই কেন যে শান্তি ছিল না।

সমীর হঠাৎ উঠতে উঠতে বলে—মনোরম, তুমি কি খেলাটা আর দেখবে? দেখলে দেখ। আমি যাচ্ছি।

-না। বলে মনোরম উঠে সমীরের পিছু নেয়।

গ্যালারির কলরোল তখনো থামেনি। উদ্দণ্ড নাচ নাচছে লোকজন। একজন বুড়ো মোটা মানুষ একসঙ্গে তিনটে সিগারেট ধরিয়ে টানছে, তাকে ঘিরে ভীড়। গ্যালারির সরু রাস্তাটা দিয়ে তারা বেরিয়ে আসে। আগে সমীর, পিছনে মনোরম। সদর পার হয়ে তারা বড় রাস্তায় এসে পড়ে।

সমীর দ্রুত লম্বা পদক্ষেপে হেঁটে যাচ্ছিল, যেন বা মনোরম তার সঙ্গে নেই। হঠাৎ থমকে সমীর মুখে ফিরিয়ে বলল—পুরুষমানুষের অনেক কাজ থাকে মনোরম। শুধু বউয়ের চিন্তা নিয়ে থাকলেই তার চলে না।

মনোরম দাঁড়িয়ে গেল। সমীর পিছন ফিরে আর তাকাল না, নিজের গাড়ির দিকে চলে গেল।

বিষণ্ণ মনোরম বড় রাস্তা ছেড়ে একা মাঠের মধ্যে নামল। তারপর প্রকাণ্ড মাঠখানা-জল-কাদা ভেঙে পার হতে থাকল। প্রকাণ্ড আকাশের নীচে মস্ত মাঠখানা বড় অফুরান, ক্লান্তিকর লাগছিল তার।

এরপর আগামী সংখ্যায়

॥ দুই ॥

ঝরঝর করে খানিকটা জল পড়ল কাঁধে। ব্লাউজের হাতটা ভিজে গেল। সীতা মুখ তুলে দেখে, ট্রামের জানালার খাঁজে জল জমে আছে। ময়দানের দিক সাদা করে আর এক ঝাঁক বৃষ্টি আসছে। নড়বড়ে জানালাটা বন্ধ করতে একবার চেষ্টা করল সীতা। পারল না। এক ভীড় লোক তাকে দেখছে। সকলের চোখের সামনে নড়বড়ে জানালা বন্ধ করার চেষ্টা করতে তার লজ্জা করছিল। অস্বস্তিতে কাঁটা হয়ে বসে থাকে সীতা। ঝরঝর করে জল পড়তেই থাকে। সরে বসবে যে তার উপায় নেই, পাশে মুশকোমতো এক পুরুষমানুষ বসে আছে। লোভী মুখচোখ, আড়ে আড়ে তাকিয়ে দেখছে।

কেনাকাটা করাটা সীতার একটা নেশার মতো। দরকার থাক বা না থাক, সীতা বরাবর দুপুরের দিকে প্রায়ই বেরিয়ে পড়ে। গড়িয়াহাটা বা নিউ মার্কেটে ঘুরে ঘুরে টুকটাক জিনিস কেনে, বেশী টাকার জিনিস নয়. সস্তা বাহারী চটি, হ্যাণ্ডব্যাগ, স্টীলের [illegible] বা চামচ, ডোনার কিংবা অন্য কোনো রূপটান। সংসারে কোনো জিনিস ফেলা যায় না। যখন সীতার সংসার ছিল, তখন সব কিছুই কাজে লাগত। এখন তার নিজের সংসার বলে কিছু নেই। তবু নেশাটা রয়ে গেছে। দু'পীস ব্লাউজের লন কাপড় কিনেছে সে, একটা শাড়িতে লাগানোর ফলস পাড়, এক কৌটো কাজল, ফাউণ্ডেশন, ভাইঝির জন্য স্টীলের চেন-এ একটা ঝকমকে লকেট, এরকম আরো কিছু কাজের বা অকাজের জিনিস। এসব তার [illegible]র ওপর জড়ো হয়ে আছে। তার ওপর ভ্যানিটি ব্যাগ [illegible] ভাঁজ করা ছাতা। ব্যাগটা ছোটো বলে সব জিনিস আঁটেনি।

ব্লাউজপীসের প্যাকেটটা ভিজে যাচ্ছে। অস্বস্তিতে আবার চোখ তুলে জলের উৎসটা দেখে সীতা। বৃষ্টিও এসে গেল। ছাঁট আসছে।

পাশের লোকটা হঠাৎ ফিস ফিস করে বলে—জানালাটা বন্ধ করে দেবো।

সীতা ঘাড়টা একটু নাড়ল মাত্র।

লোকটা উঠে সীতার ওপর দিয়ে ঝুঁকে জানলাটা বন্ধ করতে চেষ্টা করে। সীতা লোকটার বগলের ঘেমো গন্ধ পায়। বুক পেট গুলিয়ে ওঠে তার। লোকটা জানালা বন্ধ করতে বেশ সময় নিতে থাকে। ততক্ষণ দমবন্ধ করে বসে থাকে সীতা। এবং নির্ভুল ভাবে টের পায়, লোকটা তার নিজের বুকটা হালকাভাবে তার কপালে ছোঁয়াল। জানালাটা বন্ধ করে হাতটা টেনে নেওয়ার সময় খুব কৌশলে সেই হাতটা সীতার কাঁধ স্পর্শ করে গেল। সীতা দাঁতে নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরে নিজেকে সামলে নেয়। মেয়েদের শরীরের প্রতি পুরুষের দাবি-দাওয়ার শেষ নেই। হাঁটু, কনুই, হাত যা দিয়ে হোক একটু ছোঁয়ানো চাই।

জানালা বন্ধ করে লোকটা চেপে বসল। সীতা লোকটার প্রকাণ্ড ভারী উরুর ঘন স্পর্শ পেল নিজের উরুতে। যতদূর সম্ভব জানালা ঘেঁষে বসল। ঘামতে লাগল। অস্বস্তি। জানালা বন্ধ, ফলে লোকের ঘামের গন্ধ, ভ্যাপসা গরম, পাশের লোকটার উরু, এবং ক্রমে কাঁধের স্পর্শও সীতাকে আক্রমণ করে। লোকটা বুঝে গেছে, সীতা কিছু বলবে না, সে লাজুক মুখচোরা মেয়ে। তাই লোকটা ট্রাম থেমে আবার চললেই ঝাঁকুনি লাগার ভান করে ঢলে পড়ছে সামান্য। আর কেউ কিছু টের পায় না, কেবল সীতা পায়। সে ঘামে লাল হয়, আর দাঁতে ঠোঁট কামড়ায়। এসব নতুন নয়, তবু সীতার ঠিক সহ্য হয় না।

ট্রামটা থেমে গেল। রেসকোর্স পার হয়ে ব্রীজটায় উঠবার মুখে। সামনে একটা ট্রাম বোধ হয় খারাপ। সময় লাগবে।

ট্রামের ভিতরটা ক্রমে ভেপে পচে ফুলে উঠছে। পচে যাচ্ছে মানুষের শরীর। চারদিক থেকে চোরাচোখের আক্রমণ। পাশের লোকটা ঘেঁষে আসে। ঘাম। গরম। চমকা বৃষ্টিটা থেমে আবার রোদ উঠেছে বাইরে। বড় উজ্জ্বল রাংতারোদ।

সীতা ছোট্ট রুমালে মুখ, গলা মুছল। আর তখনই আবার লোকটার হাতে তার কনুই লাগে। সীতা আড়ষ্ট হয়ে নিজের কোলে হাত দুখানা ফেলে রাখে। অন্যমনস্ক থাকার জন্য সে একটা কোনো চিন্তা করার চেষ্টা করে কিছুক্ষণ। কোনো সুন্দর চিন্তা এলই না।

কেবলই ভেঙে-যাওয়া সংসারের কথাই মনে পড়ছিল সীতার। দু'টি ঘর ছিল তাদের। মাঝখানের দরজায় একটা হালকা আকাশী রঙের সার্টিনের পর্দা। সন্ধ্যেবেলা ঝোড়ো কলকাতার হাওয়া সেই পর্দাটাকে ওড়াতো বারবার। টিউবলাইটের আলোয় দু'ঘরের কোথাও কোন অন্ধকার ছিল না। এ ঘরে মেঝেয় উবু হয়ে বসে যত্নে পেয়ালায় চা ছাঁকতে ছাঁকতে সে দেখতে পেত ও ঘরে ক্লান্ত মনোরম চেয়ারে এলিয়ে বসে আছে। শুধু শার্ট ছেড়েছে আর জুতো জোড়া। পরনে ফুল প্যাণ্ট, আর স্যাণ্ডো গেঞ্জি! চোখ বোজা। যতখানি ক্লান্ত তার চেয়ে বেশী ভান করত, সীতার একটু আদর-সোহাগের জন্য। আদর-সোহাগের বড় কাঙাল ছিল মনোরম। রোগ-ভোগা মানুষ একটু নেই-আঁকড়ে আর মাথাভরা চিন্তা-দুশ্চিন্তার বাসা। চা করতে করতে সীতা মাঝে মাঝে তাকাত। মায়া-মমতায় ভরে উঠত বুক। সেটা ঠিক প্রেম নয়, গাঢ় মমতা। করুণাও। সে যাই হোক, একভাবে না একভাবে তাদের জোড় মিলেছিল তো! মনোরমের সেই চা আর সীতার স্পর্শের জন্য অপেক্ষারত দৃশ্যটা মনে পড়ে।

দৃশ্যটা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে চেষ্টা করে সীতা। পারে না। কান্না পায়। কেবলই মনে পড়ে দু'ঘরের মাঝখানে পর্দা উড়ছে হাওয়ায়, ধু ধু করে জ্বলছে নীলাভ আলো। কোনোখানে অন্ধকার

নেই। ও ঘরে তার ক্লান্ত কাঙাল স্বামী মনোরম। ভীতু খুঁতখুঁতে, অসম্ভব পরনির্ভরশীল।

সীতা শুনেছে এখন মনোরম বড় বড় চুল রাখে, লম্বা জুলপি, আর খুব আধুনিক পোশাক-টোশাক পরে। কেন এসব করে মনোরম তা সীতা জানে না, কিন্তু তখন মনোরম ভাল পোশাক পরত না। সীতা কখনো ঝকমকে শার্ট বা প্যান্ট করে দিলে রাগ করত। ক্রপ করে ছোট্ট চুল রাখত মনোরম। আবার খুব অদ্ভুত-ভাবে শুত, মনোরমের স্বভাব ছিল সীতার বুকে মুখ গুঁজে শোওয়ার। ঐ কদমছাঁট চুল খোঁচা দিত সীতার শরীরে। প্রথমে বিরক্ত হতো সীতা। তারপর বুঝেছিল মানুষটা ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখে, জেগেও নানা ভয়ের উদ্বেগের চিন্তা করে। মনে মনে বড্ড একা অসহায় ছিল তার মানুষটা। তাই সীতাকে আঁকড়ে ধরত অমন। বুকে মাথা গুঁজে শুত, এবং সেই শোওয়ার মধ্যে কোনো যৌনকাতরতা ছিল না। ছিল নির্ভরশীলতা। তাই সীতা ঐ কদমছাঁট চুলওলা মাথাটা বুকের মধ্যে ধরে রাখতে শিখেছিল। খোঁচা টের পেত না। এবং এমনই অভ্যাসের গুণ যে, ক্রমে ওভাবে মনোরম না শুলে তার অস্বস্তি হতে থাকত। ঘুমের মধ্যে কথা বলত মনোরম। কখনো চেঁচিয়ে উঠত ভয়ে। উঠে বসত। তারপর সীতাকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে বাচ্চা ছেলের মতো আকুলি-ব্যাকুলি করত। সীতা ঘুম ভেঙে বলত—আহা, ষাট ষাট। এই তো আমি রয়েছি, ভয় কী? ঠিক যেমন শিশুকে মা ভোলায়। গানের গলা ছিল না মনোরমের। কিন্তু প্রায়দিনই একটা গান সে গাইত। হঠাৎ হঠাৎ বাথরুমে, শোওয়ার ঘরে। কিংবা খেতে বসে গেয়ে উঠত—জয় জগদীশ হরে…। একটাই লাইন মাত্র। সীতা হাসত—মোটে আধখানা লাইন ছাড়া আর কিছু জানো না? মনোরম কেমন বিষণ্ণ হেসে একদিন বলেছিল—ছেলেবেলায় ইস্কুলে এই গানটা ছিল আমাদের প্রেয়ার। মনে আছে, ইস্কুলে খুব লম্বা সাত-আট ধাপ সিঁড়ি ছিল, সেখানে

সারি দিয়ে তিনশো ছেলে দাঁড়িয়ে ঐ গান গাইতাম। যন্ত্রের মতো। গানের অর্থ কিছু বুঝতাম না। একদিন কী যে হলো! অনেক দিন টানা বর্ষার পর সেদিন রোদ উঠেছে। বাহান্ন দিন টাইফয়েডে ভুগে সেদিন সকালে আমার দাদা মনোময় মারা যায়। আগের রাতে দাদার বাড়াবাড়ি হওয়ায় আমাকে প্রতিবেশীদের এক বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের বাড়ি থেকেই সকালে খেয়ে দেয়ে ইস্কুলে যাবো বলে বেরিয়েছি, রাস্তায় পা দিয়েই শুনলাম, আমাদের বাড়ির দিক থেকে কান্নার রোল উঠেছে। যেই শুনলাম অমনি ইস্কুলের দিকে দৌড়োতে শুরু করলাম। দু'কানে হাত চেপে দৌড়োচ্ছি, কাঁধের ঝোলানো বইয়ের ব্যাগটা টপাটপ ধাক্কা দিচ্ছে কোমরে, ঘেমে হাঁফিয়ে যাচ্ছি, তবু প্রথম মৃত্যু-অভিজ্ঞতার হাত থেকে আমি প্রাণপণে পালাতে লাগলাম। ইস্কুলে সেদিনও প্রার্থনার সারিতে দাঁড়িয়ে রোজকার মতো গাইছি—জয় জগদীশ হরে···। গাইতে গাইতে দেখি চোখ ভরে জল নেমেছে। চারদিকে আকাশ কী গভীর নীল, কত বড় সেই আকাশ! তার তলায় আমরা কত টুকুটুকু সব মানুষ! ছোট্ট মানুষ আমরা মস্ত আকাশের দিকে হাতজোড় করে গাইছি—জয় জগদীশ হরে······। সেই দিনই যেন গানটা মনের মধ্যে গেঁথে গেল। এখনো অন্যমনে কেবলই মনে পড়ে ঐ লাইন। আধখানা। সবটা মনে নেই। গাইলেই বহুকালের পুরোনো একটা রোদভরা আকাশ ঝুঁকে পড়ে চোখের ওপরে, কোথা থেকে যেন একটা আনন্দের, বিষাদের গভীর ঢেউ এসে আমাকে তুলে নেয়। আমি যেন তখন পৃথিবীর ধুলোময়লা থেকে ওপরে উঠে ভাসতে থাকি। তাই গাই।

এক একদিন ঘুম ভেঙে অন্ধকারে উঠে ঝুম হয়ে বসে থাকত মনোরম। সীতা ঘুমের মধ্যে বুকের ভিতরে কদমছাঁট চুলওলা মাথাটা না পেয়ে অস্বস্তি বোধ করে চোখ মেলে খুঁজতে গিয়ে দেখেছে, অন্ধকারে মনোরমের হাত মুঠো পাকানো, শরীর শক্ত, চোয়াল দৃঢ়ভাবে লেগে আছে। সীতা জানত, ওর সেই ট্রেন

দুর্ঘটনার কথা মনে পড়েছে।

তখন ও এক বিদেশী ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি। ফার্স্ট ক্লাসে উড়িষ্যা-বিহার ঘুরে বেড়াত। রোগা হলেও সুন্দর মুখশ্রী আর চালাকচতুর হাবভাবের জন্য, চমৎকার ইংরিজি বলার জন্যই অত ভাল চাকরি পেয়েছিল মনোরম। প্রায় হাজার টাকা মাইনে পেত, তার ওপর টি এ ছিল অনেক। সেবার উড়িষ্যা যাওয়ার সময়ে ঐ দুর্ঘটনা ঘটে মাঝরাতে। তখনো মনোরমের বিয়ে হয়নি সাতার সঙ্গে। কী হয়েছিল তা সঠিক জানত না সাতা। তবে মনোরম দীর্ঘদিন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে ফিরে আসে। চাকরিটা যায়নি, তবে কোম্পানি তাকে প্রতিনিধির কাজ থেকে অফিসে নিয়ে আসে নিরাপদ একটু উঁচুদরের কেরানীর চাকরিতে। মাইনে কমল না, কিন্তু টি এ বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু মনোরম ছটফট করত অন্য কারণে। ঐ যে কলকাতা ছেড়ে প্রায়ই বেরিয়ে পড়া রাতের গাড়িতে, ভোরের আবছা আলোয় গাড়ির জানালা খুলে দক্ষিণ বিহার আর উড়িষ্যার টিলা, উপত্যকা, নদী, পাহাড় আর জঙ্গল দেখে এক অবিশ্বাস্য, অসহ্য আনন্দ, সেইটাই কেড়ে নেওয়া হয়েছে তার কাছ থেকে। কোম্পানির বম্বের অফিসে কিছুদিন কাজ করেছিল মনোরম। ভাল লাগল না। আবার বিহার-উড়িষ্যার শ্বাসরোধকারী প্রকৃতির মধ্যে ঘুরে বেড়াবে, সন্ধ্যার আবছায়ায় পরেশনাথ পাহাড়ের পাদদেশে উশ্রী নদীর ছোট্ট পোলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে, ধারোয়ার তীরবর্তী টিলার গা বেয়ে উঠে যাবে আস্তে আস্তে, কয়লা খনির অঞ্চলগুলিতে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গভীর রাতে লরী ড্রাইভারের পাশে বসে দেখবে অন্ধকারের দ্রুতগামী সৌন্দর্য। অফিসের চাকরি সে সহ্য করতে পারত না। একটা নতুন ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি তখন অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি ছিটকিনি, দরজার নব, নানা রকম অ্যাঙ্গেল আর গৃহস্থালীর জিনিস তৈরি করছিল। তাদের রিপ্রেজেনটেটিভ হয়ে আবার বিহার-উড়িষ্যা ঘুরে বেড়াতে লাগল মনোরম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল

না, ট্রেন খুব জোরে চললে বা আচমকা ঝাঁকুনি লাগলে সে ঘুম ভেঙে আতঙ্কে উঠে বসত, অনেকক্ষণ বুক কাঁপত তার, ইডিও মোটর অ্যাকশন হতে থাকত। তখন চাকরি ছেড়ে সেই কোম্পানিরই এজেন্সি নিল সে।

দেখা হয়েছিল শিমুলতলায়। পুজোর ছুটিতে। প্রবাসে বেড়াতে গেলে বাঙালীদের ভাব হয়। তেমনই হয়েছিল। সীতা তার আগে কখনো প্রেমে পড়েনি। সদ্য-যুবতী, তখনো কৈশোরের গন্ধ গায়ে, তখনো শরীরে সেই আশ্চর্য স্বেদগন্ধ। ফুলের পাপড়ি ঝরে গিয়ে সদ্য ফলের গুটি ধরেছে। মনোরম পিছনে বনভূমি রেখে ঢালু রাস্তা বেয়ে নেমে আসছিল, একটু আনমনা, রুগ্ন সুন্দর চিকন মুখশ্রী, বালকের মতো স্বভাব। তারা একসঙ্গে সকলের সাথে বনভোজন করতে গিয়েছিল। ইচ্ছে করে দলছুট হয়ে হারিয়ে গিয়েছিল তারা। হিমালয়ের তীব্র শীত সবে দেখা দিচ্ছে। একটা তিরতিরে নদী বয়ে যাচ্ছিল, স্বচ্ছ জল, জলে তাদের ছায়া। ছায়ায় ঝুঁকে মনোরম ইংরিজিতে বলেছিল—মেবিলি র‍্যাং দ্য বেল, অ্যাণ্ড দে ওয়্যার ওয়েড ···কী চমৎকার টনটন উচ্চারণ সেই ইংরিজির! নিস্তব্ধপ্রায় সেই শাল জঙ্গলের ভিতরে বয়ে-যাওয়া নদীর শব্দের সঙ্গে কবিতার শব্দগুলিকে মিলিয়ে কী করে যে দিয়েছিল মনোরম! সামনেই পাহাড় ছিল, ওপরে নীল আকাশ, পাখিও কী ছিল না, আর প্রজাপতি! কী সব যে ছিল সেখানে কে জানে! ছিল বোধ হয় কবিতার সেই ঘণ্টাধ্বনিও তাদের মনে, আর ছিল শরীরের সুন্দর গন্ধ ও রোমহর্ষ, ছিল জলে ভেঙে-যাওয়া তাদের ছায়া। এ সবই থাকে। থাকে না কী! থাকে নাকি? নদীর জলে একটা পাথর ছুঁড়ে বসল মনোরম—তুমিও ছুঁড়ে দাও, ঐখানে। সীতা ছুঁড়েছিল। কী হয়েছিল তাতে? কিন্তু মনোরম হেসেছিল, সীতাও। বহু দূর থেকে বনভোজনের দলছুট মানুষজনের গলার স্বর আসছিল। পোড়া পাতার গন্ধ। তবু নিস্তব্ধতাই ছিল। তাদের কথা বলে যাচ্ছিল

সেই কুলুকুলুধ্বনিময় স্বচ্ছ জলের নদী, গাছের পাতায় বাতাস, পাখির স্বর।

ভালবাসা কিনা কে জানে! তবে তারা কেউ কাউকে ছোঁয়নি, জাপটে ধরেনি, ঐ নির্জনতা সত্ত্বেও। মনোরম শুধু বলেছিল—আমি এতদিন স্বপ্নের মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করতাম।

—সে কেমন? সীতা তারি তখনো না যাওয়া কৈশোরের কৌতূহল থেকে প্রশ্ন করেছিল।

—ছেলেবেলা থেকেই আমার প্রেমের শখ। এত বেশী শখ যে, ছেলেবেলা থেকেই আমি কাল্পনিক মেয়েদের সঙ্গে একা একা কথা বলি। সেই সব মেয়েদের একজন ছিল রিণা। কিন্তু রিণা ঠিক কাল্পনিক ছিল না। আমার আট দশ বছর বয়সে আমি সত্যিই এক রিণাকে দেখেছিলাম। তারও বয়স ছিল আমার মতোই। পরিচয় ছিল না, কখনো কথা হয়নি, একবারের বেশী দেখা হয়নি, তার মুখ এখন আর আমার মনেও নেই। শুধু মনে আছে, এক বিয়েবাড়ির সিঁড়ির রেলিঙে ঝুঁকে সে বর-বউয়ের কড়িখেলা দেখছিল। পরনে লাল ফ্রক, মুখখানা ঘিরে ফ্রিলের মতো চীনেছাঁটের চুল। বয়স্কা এক মহিলার গলা তলার হলঘর থেকে তার নাম ধরে ডেকে বলেছিল—রিণা নীচে আয় না, অত লজ্জা কিসের! রিণা তার সুন্দর ভ্রূ কুঁচকে একটু চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নীচের ভিড়ের মধ্যে নেমে গিয়েছিল। এতদিন আগেকার সে ঘটনা, আর আমিও এত ছোটো ছিলাম যে, সেই স্মৃতি একটু সুগন্ধের মতো মাত্র অবশিষ্ট আছে। কখনো মনে হয় সে ঘটনা ঘটেইনি, আমার মাথা তা কল্পনা করে নিয়েছে, অথবা আমি কখনো স্বপ্ন দেখেছিলাম। ঐ উৎসবের বাড়ি আর ঐ মেয়ের কথা আমি অনেক ভেবেছি, কখনো সত্য, কখনো কাল্পনিক মনে হয়েছে। তবে সেই নামটা কী করে মনে রয়ে গেছে, মনে রয়ে গেছে যে মেয়েটি বড় সুন্দর ছিল—যার সঙ্গে আর কখনো দেখা হয়নি। কিন্তু তাতে আমার কোনো অসুবিধা হয় না। আমার মনে যেসব

অচেনা মুখ ভেসে যায়, তাদের কাউকে কাউকে রিণা বলে মনে হয়। ঐ নামে ডাকি, সাড়া পাই, ভালবাসা জেগে ওঠে, বিশ্বাস হয় কী?

—না।

—তবে তোমাকে বলি, আমার মেম-বউয়ের কথা?

—বউ? বলে ভীষণ উৎকণ্ঠায় তাকিয়ে থেকেছিল সীতা।

—না না, আসলে সে কেউ না। আমাদেব আলমারিতে ছিল পাথরের তৈরী এক মেমসাহেব পুতুল। তার গোলাপী গা, গোলাপী গাউন, হাঁটু পর্যন্ত সেই গাউনের ঝুল, চোখেব তারা নীল। ছেলেবেলায় ঠাকুমা সেই পুতুলটা দেখিয়ে বলত—তোর বউ। আশ্চর্যের কথা, এখনো মাঝে মাঝে যখন কখনো আমার কাল্পনিক বউয়ের কথা ভাবি, তখন ঠিক সেই গোলাপী গা, সোনালী ফ্রক, নীল চোখ, মধুরঙের চুলওলা পুতুলটাই চোখে ভেসে ওঠে। হায়, তার বাস্তবতা নেই, তবু সে আমার মনের মধ্যে চলাফেরা করে, ঘরদোর গুছিয়ে রাখে, গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে আমাব কাল্পনিক সন্তানের চুল আঁচড়ে দেয়, দিনশেষে জানালার ধারে বসে আমার অপেক্ষায় চেয়ে থাকে।

—এখনো? আজও?

মিটমিট করে হেসে মনোরম বলেছিল—ছেলেবেলায় আমি খুব অদ্ভুত ছিলাম। দরজা, জানালা, দেয়ালের সঙ্গে কথা বলতাম। কত সব কথা! মানুষের সঙ্গেই আমার কথা হত কম। কিন্তু কথা হত কল্পনার মানুষদেব সাথে। (রোজ যাদের দেখতাম, তাদেরই কাউকে কাউকে মনে মনে কুড়িয়ে আনতাম, কল্পনায় খেলব বলে।) আমাদের মফঃস্বল শহরের স্টেশনে একটা নির্জন সুন্দর ওভারব্রীজ আছে। সাধারণত লোকে হেঁটেই লাইন পার, হয় ওভারব্রীজ বড় একটা ব্যবহার করে না। আমাদের ওভারব্রীজটা তাই জনশূন্য পড়ে থাকত। আমি সন্ধ্যেবেলায় ওখানে দাঁড়িয়ে প্রায়ই দূরের দিকে চেয়ে থাকতাম। আমি যে-স্বপ্নের জগতে বাস করতাম,

সেখানে বাস করতে গেলে, চেনা লোক, বন্ধুবান্ধব, ঘনিষ্ঠ লোকজন এক বিষম বাধা। তাতে স্বপ্নের সুতো বারবার ছিঁড়ে যায়। আমারও তাই তেমন কেউ ছিল না, তাই আমারও অধিকাংশ বিকেল কাটত নিঃসঙ্গভাবে ওভারব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে দূরের দিকে চেয়ে স্বপ্ন দেখতে দেখতে। কল্পনার ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে যেত। সেদিন সন্ধো সাতটার শেষ ট্রেন আমাদের ছোট স্টেশন ছেড়ে গেছে। ওভারব্রীজে দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম শূন্য প্ল্যাটফর্মে কিছু ছড়ানো মালপত্রের মাঝখানে একটি তোরঙ্গের ওপর মেয়েটি বসে আছে। উদ্বিগ্ন তার মুখচোখ। কাছাকাছি সময়ে আর ট্রেন নেই, পরের গাড়ি ভোরবেলায়। মেয়েটি যে কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাবে কে জানে? আমি মাত্র এইটুকু দেখেছিলাম। আর মনে হয়েছিল মেয়েটি যেন আমার আবছাভাবে চেনা। এর বেশী আর বাস্তবে কিছু ঘটেনি, ঘটেছিল বোধহয় কল্পনায়।

মনোরমের আবার সেই হাসি, শব্দহীন, অর্থময়।

—বলুন না! বলে শরীরের সুগন্ধ নিয়ে কাছাকাছি এগিয়ে গিয়েছিল সীতা। উন্মুখ পানপাত্রের মতো।

—তারপর তাকে আবার দেখি আমাদের ফুলবাগানে, শীত-কালের ভোরবেলায়। পাড়ার বাচ্চা মেয়েরা রোজ সকালে আমাদের বাগান থেকে ফুল চুরি করে নিয়ে যায়। একদিন রাতে ঘুম হয়নি, সারারাত ভয়ঙ্কর সব কল্পনার ছবি দেখেছি। সকালে তেষ্টা পেল আর খোলা বাতাসের জন্য আকুল ব্যাকুল হয়ে বেরিয়ে এলাম। বাগান তখন ঘন কুয়াশায় ঝিম মেরে আছে।, আমি দেখলাম, বাগানের ফটকের কাছে একটি মেয়ে ভিখিরির মতো দাঁড়িয়ে। ও কি ফুলচোর? আমি সাড়া দিইনি, চেয়েছিলাম। সেও একদৃষ্টে আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ মৃদু হাসল। আমি ভয়ঙ্কর চমকে উঠে চিনলুম, এ সেই মেয়ে যাকে আমি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দেখেছিলাম এবং আরো আগে কবে থেকে যেন চেনা ছিল। সে হেসে এগিয়ে

আসতে থাকে ফটক পার হয়ে। আমি হিম হয়ে দাঁড়িয়ে, তার পরনে নীল শাড়ি, গলায় কাশ্মীরি স্কার্ফ জড়ানো, ঠিক যেরকম স্কার্ফ আমার মায়ের একটা আছে, নীল শাড়িটাও যেন চেনা। সে লাল সুরকির পথ দিয়ে অনেকটা এগিয়ে এসে মিহি গলায় জিজ্ঞেস করল—এ বাসায় তুমি থাকো? আমি মাথা নেড়ে জানালাম—হ্যাঁ। সে হাসল—তোমাকে সেদিন দেখেছিলুম স্টেশনে ওভারব্রীজের ওপর দাঁড়িয়েছিলে। বিড়বিড় করে কী বকো তুমি বলো তো? তোমার ঠোঁট নড়ছিল। আমি হেসে মাথা নেড়ে বললাম—কী জানি, হবে হয়তো। সে এবার কাছে এগিয়ে আসে, খুব কাছে। বলে—আমি সেই ছেলেবেলায় করে তোমাকে দেখেছিলাম, আর এখন তুমি কত বড় হয়ে গেছ। তুমি কেমন মানুষ হয়েছো তা তো জানি না। কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয়, তুমি খুব সৎ আর তোমার মনে খুব মায়া। আমি হাসলাম—কী জানি! জানি না। সে বাগানের দিকে একবার ফিরে দেখে নিল, বলল—সৎ লোকেরা কখনো সুখী হয় না। তুমিও দুঃখী বোধ হয়। আর দেখছি তুমি তেমন সবল হওনি, দৃঢ়চেতা হওনি, তাই না? আমি মাথা নাড়ি—হ্যাঁ, ঠিক তাই। সে সুন্দর সকালের রোদের মতোই ফুটফুটে হাসি হাসল—ছেলেবেলার কবেকার এই পুরোনো ভুলে যাওয়া মফস্বল শহরে এতদিন পর আমি আবার কেন এসেছি জানো? তোমার জন্যই। বলে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে—আসব তোমার কাছে মাঝে মাঝে আসব। শুধু এই খুব অসময়ে দেখা হবে, যখন মানুষ ঘুমোয় কিংবা কেউ থাকে না কোথাও। অসময়ে—মনে রেখো। বলতে বলতে সে পিছন ফিরল। আমাদের বাগানে গাছপালা ঘন, সারাদিন ছায়ায় অন্ধকার হয়ে থাকে। সে এইসব গাছগাছালির মায়াময় ছায়াচ্ছন্নতার ভিতরে চলে গেল। আর তাকে দেখা গেল না। আমি আবার পড়ে থা...ায় উঠলাম পরদিন। আমাদের কুয়াশায় আচ্ছন্ন বাগানে দিকে চেয়ে... না। আমি সুরকির পথ ধরে বাগান থেকে বেরিয়ে

এলাম রাস্তায়। ঝুম কুয়াশায় খুব ভোর-আলোর ভিতরে যতদূর চোখ যায় চেয়ে দেখলাম, সব শূন্য। সে নেই। তখনই আমি বুঝতে পারলাম যে, এ ভুল। আমি আগের দিন ভোরে বাস্তবিক কাউকেই দেখিনি। সে আমার কল্পনা। ফিকে বিষাদে আমার মন ছেয়ে গেল। তবে আমার একটা সুবিধে এই যে আমার কিছু হারায় না। আমি কল্পনায় সব পেয়ে যাই। সেখানে সেও রয়ে গেল চিরদিনের মতো। ভাবতে ভাবতে আমি ভোর, শীতল, প্রায়ান্ধকার জনশূন্য রাস্তায় রাস্তায় অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। স্বপ্নের সেই মেয়েটি আমাকে কথা দিয়েও ভুলে গেছে বলে কোনো ক্ষোভ রইল না।—ইচ্ছে থাকলেও আমি রোজ রাতে একই স্বপ্ন দেখতে পারি কী? তবে দুঃখ কিসের? ফিরে এসে দেখি ফটকের কাছে আমার ছোটো বোন মাধবীলতার আর্চের কাছে দাঁড়িয়ে, মা বারান্দায়। শুধু আমি সামান্য বিস্ময়ের সঙ্গে দেখি, আমার বোনের পরনে চেনা নীল শাড়ি, আর মায়ের গলায় সেই কাশ্মীরী স্কার্ফ জড়ানো।

—এ তো স্বপ্ন!

—স্বপ্ন না থাকলে এই অতি সুকঠিন, বিবর্ণ বাস্তবতা নিয়ে আমি কিভাবে বেঁচে থাকব? একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি, আমার মশারির এক ধার তুলে সে আমার দিকে ঝুঁকে চেয়ে আছে। আমার চেতনা জুড়ে তীব্র ভয় লাফিয়ে উঠল। বল-এর মতো লাফাতে লাগল আমার হৃৎপিণ্ড। সে মৃদু হাসল—তুমি খুব দুর্বল? কেন? আমি জবাব দিলাম না। সেদিন তার পোশাক ছিল গোলাপী, তাতে জরির কাজ। সে স্নেহের একটি হাত আমার বুকের ওপর ফেলে রেখে ধীরে ধীরে বসল। আমি দেখলাম, সে সালোয়ার আর কামিজ পরে আছে। আমার স্মৃতি তার টানে আমাকে একবার অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে কী যেন দেখে নিতে বলল। আমি কিছুই মনে করতে পারলাম না। সে আবার মৃদু হেসে বলল—ছেলেবেলা থেকেই তুমি দুর্বল।

তোমার মাথায় স্বপ্নের বাসা, তোমার মনে একরত্তি বাস্তবতা নেই। বলতে বলতে সে আরো ঝুঁকে পড়ে সামান্য তীব্রস্বরে বলল—আমাকে মনে পড়ে না তোমার? একদিন আমরা বন-ভোজনে গিয়েছিলাম ছেলেমেয়েরা। দলছাড়া হয়ে তুমি আর আমি পালালাম নদীর ধারে! তুমি ছিলে ভীতু, আমি সব সময়ে তোমাকে সাহস দিতাম। সেই নদীর ধারে আমি তোমাকে কবিতা শুনিয়েছিলাম। তুমি ছিলে বোকা, আসলে কবিতার ভিতর দিয়েই আমি তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম যে, আমি তোমাকে…। তুমি ভয়ঙ্কর অস্বস্তি আর অস্থিরতায় তার মানে বুঝবার চেষ্টা করোনি। তুমি বলেছিলে, পায়ে পড়ি ফিরে চলো। মনে পড়ে? আমি বললাম—না। মনে পড়ে না! আবার সেই হাসি হাসল সে —দ্বিধামুক্ত, কোমল কিন্তু জীবনশক্তিতে ভরা। বলল—তুমি সব পেয়েও পেতে চাও না, কেবল পালাতে চাও স্বপ্নের ভিতরে। তাই আমাকে অনেক রাস্তা পার হতে হলো। তার গলার স্বরে এবার আস্তে আস্তে আমার সামান্য সাহস ফিরে আসে। বললাম—কোথা থেকে এলে তুমি অত বাক্সবোঝা নিয়ে? রেল গাড়িতেই তুমি কী এসেছো? অনেক দূরে থাকো কী তুমি? না, ছেলে-বেলার তোমাকে আমার মনে নেই। তুমি কী রিণা? কিংবা আর কেউ, যাকে মনে নেই? সে আমার মাথার ঝুঁটি নেড়ে দিল, বলল—তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। হায়! আমাকে তোমার মনে পড়ল না? অথচ কতদূর থেকে আমি এলুম শুধু তোমার জন্যই। কথা বোলো না, আমার হাত ধরে চুপ করে শুয়ে থাকো। শোনো, আমি তোমাকে একদিন আমাদের বাড়ির একটা গোপন কুঠরীর তালা খুলে ভিতরে নিয়ে গিয়েছিলুম। সেই ঘরে ছিল কাঠের একটা পুরোনো সিন্ধুক। তার ভিতরে ছিল অনেক কাগজপত্র, রহস্যময় অনেক পুরোনো দলিল, অনেক চিঠি। তুমি আর আমি আমাদের নিষেধের ছেলেবেলায় এক দুপুরে বসে অনেক চিঠি পড়েছিলুম একসঙ্গে। সেইসব চিঠি

ছিল আমার মা আর বাবার মধ্যে লেখা প্রেমপত্র। না ভুল বললাম, শুধু প্রেমপত্র নয়, সেগুলো বিয়ের পরে লেখা। কিছু সাংসারিক কথাও তার মধ্যে ছিল। পড়তে পড়তে, হাসতে হাসতে আমরা এক সময়ে দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে চুপ করে বসেছিলুম। সেই কাঠের সিন্ধুকের ওপর অনেক পুরোনো কাগজের গন্ধের মধ্যে। মনে পড়ে? তোমার মনে নেই, কেননা সে সবই অতি তুচ্ছ ঘটনা, খুব সামান্য, তাদের যত্ন করে আমিই মনে রেখেছি এতদিন। হায়! সেসব তুচ্ছ ঘটনা ছাড়া আমার আর কিছু নেই। তোমাকে সেইসব ফিরিয়ে দিতে এসেছি। দিয়ে গেলুম। আমি তার হাত মুঠো করে ধরে রইলুম। সে অন্ধকার ঘরের চারদিকে চাইল। বলল—এই ঘরে আর কে থাকে? ঐ বিছানায় তোমার বুড়ি ঠাকুমা আর ছোটো ভাই বোন, না? আর পাশের ঘরে তোমার মা বাবা, তাই না? আর এই ছোট্ট বিছানায় তুমি! সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল—সুন্দর সংসার তোমাদের। শান্ত পরিপাটি ভাল মানুষদের পরিবার। তোমাদের ঘরের আনাচে কানাচে সুন্দর সব স্বপ্নেরা ঘুরে বেড়ায়, প্রজাপতির মতো ওড়ে কল্পনা! এরকম পরিবারই আমি ভালবাসি। এতদিন হয়ে গেছে, এখন আর বলাই যায় না যে, আমি তোমাকে…। সে থেমে শুধু আমার দিকে চেয়ে রইল। ঘরে কোথাও আলো ছিল না, কিন্তু আমি তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। কামিজের কলারের জরি তার ঘাড়ের সুন্দর রঙের ওপর জ্বলছে। তার মেরুন ঠোঁট থেকে শিউলি ফুলের মিষ্টি গন্ধে ভরে যাচ্ছে ঘরের বাতাস। তার নরম হাত ক্রমশ গলে যাচ্ছে আমার হাতের মৃদু উত্তাপে। সে অনেকক্ষণ ঐভাবে বসে রইল। আমি তার দিকে চেয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর সে হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে মৃদু গলায় বলল—ঘুমোও। যতক্ষণ ঘুমিয়ে না পড়ো ততক্ষণ বসে থাকব। তৎক্ষণাৎ আমি বললাম—তাহলে ঘুমোবো না। এসো, দু'জনে জেগে থাকি। সে তার দুটো আঙুল আমার

চোখের ওপর রাখল, সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীর জুড়ে নেমে এল সম্মোহন, ঘুমের এক ঢল।

নিথর হয়ে গল্পটা শুনেছিল সীতা। প্রায় কিশোরী-বয়সী সে অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করেছিল—সেই বনভোজনে কী কবিতা সে শুনিয়েছিল ?

মনোরম তৃপ্তির হাসি হেসে একটা নুড়ি ছুড়ে দিল জলে, বলল—মেবিলি র‍্যাং দা বেল, অ্যাণ্ড দে ওয়্যার ওয়েড···।

সীতা মুখ নীচু করে ছিল তারপর। নদীটা তট অতিক্রম করে তার বুকে উঠে এল। তারপর বুক জুড়ে বয়ে যেতে লাগল। তখন দূরে দু' একটা কণ্ঠস্বর তাদের নাম ধরে ডাকছিল। তারা কেউ উত্তর না। শুনতে পেল না।

সীতা মৃদুস্বরে বলল—এ সবই গল্প।

—গল্পই! তোমাকে বলি, চপলা ছাড়া কোনো অনাত্মীয়া মেয়ের গা আমি কখনো ছুঁইনি, ছোঁয়ার মতো করে। অনাত্মীয়াই বা বলি কি করে। চপলা আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়াই ছিল। আমরা দেশের বাড়িতে যখন যেতাম, তখন বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের একটা বেশ বড় দঙ্গল এক ঢালাও বিছানায় শুতাম। তখন প্রায়ই চপলা আমার মাথার বালিশে ভাগ বসাতো। আমার অসতর্ক ঠোঁটে চুমু খেত, ভয়ে আমি কাঠ হয়ে থাকতাম। সঞ্জীবচন্দ্রের একটা উপন্যাসে ছেলেবেলায় আমি একটা প্রেমের ঘটনা পড়ি। নায়িকা তেলের প্রদীপ হাতে রাত্রিবেলায় নায়ককে দেয়ালের ছবি দেখাচ্ছে ঘুরে ঘুরে। ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎ নায়ক মুখ ফিরিয়ে বলল—তোমার গায়ে কী আশ্চর্য সদ্‌গন্ধ। শুনে প্রদীপ ফেলে নায়িকা ছুটে পালিয়ে গেল। ঐ কথা দীর্ঘকাল ধরে গুন গুন করে ওঠার মতো আমার মনে রয়ে গেছে, তোমার গায়ে কী আশ্চর্য সদ্‌গন্ধ! চপলার শরীরের গন্ধ মনে নেই। বোধহয় সে ঘামের, তেলের, কচি ঠোঁটের মিলিত গন্ধ—কিশোরী বা বালিকার গায়ে বোধহয় ওরকমই গন্ধ না ?

তবু এখনো যখন গভীর রাতে কল্পনায় চপলা চুপি চুপি মশারি সরিয়ে সেই ছেলেবেলার দেশের রাত্রির মতো কাছে আসে, তখন এখনো আমি ফিসফিস করে বলে উঠি—তোমার গায়ে কী আশ্চর্য সুন্দর গন্ধ! চপলা প্রদীপ ফেলে পালায়।

এ টুকু বলে মনোরম প্রতীক্ষায় চেয়েছিল।

কী বলবে সীতা? তবে সে ইঙ্গিত বুঝেছিল। অবশেষে বলল—সে সব তো স্বপ্নে!

—স্বপ্নই। কিন্তু আর তো কখনো তাদের স্বপ্ন দেখব না।

—কেন?

মনোরম তীব্র হাতে আবার নুড়ি ছুড়ে মারল জলে, বলল—সে সব রেখে গেলাম ঐখানে। নদীতে। চপলা, রিণা, আর সব···

—তবে কী থাকল?

—তুমি বলো তো?

—আমি কী আর কখনো সেই আশ্চর্য গন্ধ পাবো? পাবো না বোধহয়, না?

কৃত্রিম দুঃখে ভরা গলায় বলেছিল মনোরম।

—কী জানি

—তুমি বলো।

মনোরম স্পর্শ করেছিল তাকে, কী সাহস! অনেকক্ষণ বুক ভরে টেনেছিল বাতাস, নতুন ফোটা ফুলের গন্ধ যেমন নেয় লোকে ঠিক তেমনি। সীতার সুন্দর গন্ধ নিয়েছিল মনোরম। বলেছিল—আমি আর স্বপ্ন চাই না।

প্রবাসে, বিদেশে ছুটিতে যায় যুবক-যুবতীরা। কাছাকাছি হয়, একটু রঙ ছোড়াছুড়ি করে। কলকাতায় পা দিয়ে সব ভুলে যায়। বাইরে থেকে ঘরে এসে যেমন বাইরের ধুলো

হাত পা থেকে ধুয়ে ফেলে লোক তেমনি ধুয়ে ফেলে সব স্মৃতি। কিন্তু সীতা ভোলেনি। কলকাতায় ফিরেও।

সীতার দেওয়া টেলিফোন নম্বরটা হারিয়ে ফেলেনি মনোরমও। টেলিফোন করেছিল।

আজ বহুকাল বাদে বৃষ্টিতে-ধোয়া ময়দান পেরিয়ে, ব্রীজ পেরিয়ে, ঢালু বেয়ে যখন নেমে যাচ্ছে ট্রামগাড়ি, তখন সীতা স্পষ্ট সেই বহুকালের পুরোনো টেলিফোনটা কানে তুলে শুনছিল কাঁপা কাঁপা একটা ভীতু গলা—আমি মনোরম। তুমি কী সীতা?

গায়ে কাঁটা দেয়। এখনো।

কলকাতায় তো সেই বনভূমি নেই, স্বচ্ছ জলের নদীটিও নেই। তবু মানুষ ইচ্ছে করলে মনে মনে সেই বনভূমি আর সেই নদী সৃষ্টি করে নিতে পারে। তারা নিয়েছিল।

ভালবাসা? হবেও বা। তখন মনোরম বড় ছন্নছাড়া, চাকরি ছেড়ে এজেন্সি নেওয়ার কথা মাঝে মাঝে বলে। সীতার বাবা ব্যাপারটা আন্দাজ করে বলল—ও ছেলে এখনো লাইন পাচ্ছে না, ওর কী কোনো কেরিয়ার তৈরী হচ্ছে?

তবু বিয়ে হয়েছিল। (যেসব ছেলেরা নিজেরা যেচে মেয়েদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে, তাদের কেমন যেন পছন্দ হয় না সীতার।) মনোরমও করেনি। সীতা করেছিল প্রস্তাব।

তারা সুখী হয়েছিল কিনা তা ঠিক বুঝতে বা ভাবতে চেষ্টা করেনি সীতা। (সে শুধু ধীরে ধীরে কদমছাঁট চুলওলা মাথাটাকে ক্রমে নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরে রাখতে শিখেছিল। ভালবাসা কী এরকমই কিছু? আর একজনের ইচ্ছাকে নিজেরও ইচ্ছা করে নেওয়া? নাকি আরো বড় বিশাল কিছু?)

সীতা ভেবে পায় না। আজও বড় মনে পড়ে, দু'ঘরের মাঝখানে নীল পর্দাটা উড়ছে ঝোড়ো হাওয়ায়, দু'ঘর উদ্ভাসিত

আলো। এ ঘরে চা ছাঁকছে সীতা ও ঘরে ক্লান্ত মনোরম বসে আছে। অপেক্ষায়। কেবলই এই দৃশ্যটা মনে পড়ে। ঘরের আনাচে কানাচে সুখ তার অঙ্কুরের ডানা মেলেছিল কিনা কে জানে। তবু দৃশ্যটা বোধহয় আজ সুখী করে সীতাকে। দুঃখীও করে।

ট্রামগাড়ি অনেকক্ষণ ধরে থেমে থেমে চলে। রাস্তা যেন আর ফুরোয় না। বৃষ্টি থেমে গেছে কখন। শেষ বেলার রোদ উঠেছে। খোলা জানালা দিয়ে উদাসীন চেয়েছিল সীতা। পাশে বসা পুরুষ কিংবা মানুষের লোভী চোখের আক্রমণ আর টের পাচ্ছিল না সীতা।

একটা মেঘের স্তরের ভিতরে সূর্য ডুবে গেল। সীতা বাড়ির রাস্তায় এসে পড়ল যখন, তখন হালকা অন্ধকার ছেয়ে যাচ্ছে। একটু অন্যমনে হাঁটছিল, বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়ানো অপেক্ষারত মানুষটিকে সে প্রথমে লক্ষ্য করেনি। কাছাকাছি হতেই লোকটা তীব্র শ্বাসের শব্দ করে ডাকল—সীতা।

চমকে উঠে তাকিয়ে সে মজবুত কাঠামোর প্রকাণ্ড শরীরওলা মানসকে দেখতে গেল। মানস লাহিড়ী।

এক পা এগিয়ে এসে মানস বলে—এখন বাড়িতে ঢুকো না।

—কেন?

—তাহলে আর বেরোতে পারবে না, আবার পারমিশান ফারমিশান নিতে হবে। তার দরকার কী? চলো কেটে পড়ি, ঘুরে-টুরে একেবারে ফিরবে।

—সেই জন্যই আপনি দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তায়?

—সেই জন্যই। তোমাকে মাঝপথে ধরব বলে। চলো জিনিসগুলো আমাকে দাও নিচ্ছি। কোথায় গিয়েছিলে?

—মাঝে মধ্যে বেরিয়ে পড়ি। এমনি ঘুরে এলাম একটু।

—ট্যাক্সি নেবো ?

সীতা হাসল। বলল—ট্যাক্সি কেন ? অনেক দূরের প্রোগ্রাম ?

—না, না। কোনো প্রোগ্রাম নেই। যেখানে খুশী একটু যাবো। কত কথা জমে আছে।

দু'জনে আবার বড় রাস্তার দিকে হাঁটতে থাকে। পাশাপাশি।

—খড়গপুরে গিয়েছিলাম ক'দিনের জন্য। মানস বলে।

—জানি তো ? সীতা হাসল।

জানো তো বটেই। কিন্তু এ ক'দিন তোমাকে না দেখে কীরকম কেটেছিল খড়গপুরে তা তো বলিনি।

সীতা মাথা নীচ করল একটু। কথা বলল না।

—আমার শরীরে কোনো রোগ নেই, তবু এ ক'দিন আমার শরীর জ্বর-জ্বর করেছে। মাথা ধরেছে। ইন্টার রেল ওয়েটলিফটিং-এ আমি ছিলাম একজন জাজ, কিন্তু জাজমেন্টও দিয়েছি আবোল তাবোল। কিছু ভাল করে লক্ষ্যই করি নি। ভাবছি কী করে পাতিয়ালায় যাবো এইরকম তোমাকে ছেড়ে।

সীতা তেমনি মুখ নীচু করে থাকে।

—শুনছো ?

—হুঁ।

—কিছু বলো

—কী বলব ?

কী ভাবে যাবো পাতিয়ালায় ? ওখানে কোচদের ট্রেনিং তো অনেক সময় নেবে আরো। খড়গপুরে মাত্র ক'দিনেই যা অবস্থা হয়েছিল।

সীতা একটা শ্বাস ফেলল। কিছু বলল না।

—কিছু বলো।

সীতা একটু সঙ্কোচ বোধ করছিল। তবু বলল—এক বছর হতে আরো তিন মাস বাকি আছে। তারপর তো·

ঝকঝক করে ওঠে মানসের চোখ, সীতার দিকে ঝুঁকোল

—তারপর কী ?

সীতা সুন্দর দাঁতে নীচে ঠোঁট কামড়াল।

মানস মুখটা সরিয়ে নিয়ে বলে—ওসব কে আর মানছে ? তিন মাস আমি অপেক্ষা করতে পারছি না।

—তাই কি হয় ?

—কেন হয় না ?

—তিনটে মাস চলে যাবে দেখতে দেখতে।

—তিনটে মাস কিছু কম সময় নয় সীতা। আমরা ইচ্ছে করলে এই তিনটে মাস গেইন করতে পারি।

—ও যদি বাধা দেয় ?

—কে ?

—ও। বলে মাথা নোয়ায় সীতা।

—মনোরম ?

—হুঁ।

—মনোরম ! মনোরম কেন বাধা দেবে ?

–যদি দেয় ?

—কেন দেবে ? ওর কোনো ইন্টারেস্ট তো আর নেই।

–নেই ? ঠিক জানেন ?

মানস শব্দ করে হাসে।

—নেই আমি জানি। তাছাড়া মনোরম এখন ধ্বংসস্তূপ। জাস্ট এ হিপ্ অব ডেব্রিস্। বাধা দেওয়ার ক্ষমতা ওর আর নেই।

সীতা চুপ করে থাকে।

—আজকাল রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে বেড়ায়।

—থাকগে। আমি শুনতে চাই না। সীতা বলে।

—থাক। আমিও ঠিক বলতে চাই নি। তবে এক সময়ে ও আমার বন্ধু ছিল। আই ফিল্ ফর হিম্।

সহজেই পাওয়া গেল ট্যাক্সি। বড় রাস্তার মোড়েই সওয়ারী নামাচ্ছিল ট্যাক্সিটা। মানস 'চলো' বলে দৌড়ে গিয়ে ধরল।

ড্রাইভার 'কোথায় যাবেন?' এবং তারপর, 'গাড়ি খারাপ আছে দাদা' বলে এড়াতে চেয়েছিল। মানস কোনো কথাই গ্রাহ্য করল না। শান্ত হাতে দরজা খুলে সীতাকে আগে উঠতে দিল তারপর নিজে উঠল। দরজা বন্ধ করে ড্রাইভারকে বলল—গোলমাল কোরো না, যেদিকে বলছি সেদিকে যাবে, নইলে···ড্রাইভার ঘাড় ঘুরিয়ে একপলক দেখে নিল মানসকে, তারপর স্টার্ট দিল।

সীতা জানে, এ অবস্থায় মনোরম হলে ট্যাক্সিওয়ালাই জিতে যেত। মনোরম কিছুতেই এত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ট্যাক্সি ধরতে পারত না।

মানস একটু ঘন হয়ে বসল। ট্রামে সেই মুশকো লোকটার মতোই অবিকল। তবে সীতা এবার সরে গেল না। মানসের একটু ভাঙা চৌকো মুখ, মাথায় পাতলা চুল, চমৎকার দু'খানা হরিণ চোখে এক ধরনের মারাত্মক সৌন্দর্য আছে। ওর শরীরটা যেমন কর্কশ আর প্রকাণ্ড আর জোরালো, চোখ দু'খানা তেমনই মায়াবী। কাজলের মতো টানা একটা রেখা আছে ওর চোখে, জন্মগত। কথা যখন বলে তখন বড় সুন্দর শোনায় ওর গলা, ঘোষণাকারীদের মতো।

হাত বাড়িয়ে নরম জোরালো পাঞ্জায় সীতার হাত ধরল মানস। সীতা কোনো সঙ্কোচ বোধ করে না। কেবল একটা অস্বস্তি তার হয়। সেটা হাস্যকর অস্বস্তি। মনোরম খুব সিগারেট খেত। তাই যখনই মনোরমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতো সীতা তখনই, সিগারেটের গন্ধ পেত। সিগারেটের জন্য সে কম বকেনি মনোরমকে। কিন্তু গন্ধটা তার বুকে, শিরায়, সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে যেন পুরুষের গায়ে ঐ গন্ধ থাকবেই। ওটাই বুঝি পুরুষের গন্ধ। মানস সিগারেট খায় না। ট্যাক্সিতে এত কাছাকাছি বসেও সীতা তাই পুরুষের সেই অমোঘ গন্ধটি পাচ্ছিল না। একটা কেমন অস্বস্তি হয় তার। পুরুষের সেই অমোঘ গন্ধটির জন্য সে উন্মুখ হয় বুঝি মনে মনে।

ব্যাপারটা কিছু নয়। সকলকেই যে এক রকমের হতে হবে তার কী মানে আছে! সীতার হাতখানা নিয়ে আঙুলে আঙুলে আশ্লেষে খেলা করল মানস। সীতা বাধা দিল না। একজনের সঙ্গে বউ হয়ে থাকার অভ্যাস ছেড়ে আর একজনের বউ হওয়ার অভ্যাস রপ্ত করা সহজ নয়। এই নতুন অভ্যাসকে নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল সীতা।

—কোথায় যাচ্ছি আমরা?

—আগে কিছু খাই। বড্ড খিদে।

—জানি। খুব খিদে পায় আপনার।

মানস হাসল। পরিতৃপ্তির সঙ্গে বলল—ঠিক ধরেছো। আমার শরীরটা যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি আমার প্রকাণ্ড খিদে। সব রকম খিদে।

অর্থপূর্ণ হাসছিল মানস। সীতার খাটো ব্লাউজের তলায় পেট পিঠ খোলা। মানসের হাত সীতার করতল ছেড়ে উঠে এল কোমরে। নরম আঙুলে সে সীতার শরীরের মাংসে আঙুল ঢুকিয়ে দিচ্ছিল। মানস এতকাল এসব করেনি। এখন বোধ হয় ওর ধৈর্য ভেঙে যাচ্ছে। মুখের সামনে মাংস, তবু খাবে না, এ কী রকম! সীতা একটু হাসে। তার অনিচ্ছা হয় না। আর একটু ঘন হয়ে বসে মানসের শরীরের সঙ্গে। পেটের কাছে মানসের হাতটা চেপে ধরে রাখে এক হাতে। তার অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। সে অভ্যাস করে নেবে। এই বড় চেহারার শক্ত মানুষটির কাছাকাছি বসে সে নির্ভরতা পাচ্ছিল।

মানস ফিস্‌ফিস করে বলল—আমাকে 'তুমি' করে বল।

—বলব।

—এখনই।

—তুমি।

—ব্যাস্, হয়ে গেল। বলে হাসল মানস।

সীতা কিছু বুঝতে পারে নি, আচমকা খোঁপার নীচে তার

ঘাড়টা চেপে ধরে মানস। অন্য হাতে থুতনি ধরে একপলকে মুখটা ফিরিয়ে নেয় তার দিকে। চুমু খায়। ছোট্ট চুমু, কয়েক সেকেণ্ডের।

সীতা ছাড়া পেয়ে বলল -ট্যাক্সিতে? ওঃ মা!

—ও দেখছে না।

সীতা খুব আস্তে বলে—ওর সামনে আয়না রয়েছে।

—দেখলেই কী? আস্তে বলে মানস।

—কী ভাববে?

-কিছু ভাববে না। কলকাতার ট্যাক্সিওলাদের অভ্যাস আছে দেখে।

—যাঃ! সীতা হাসল।

এবং মানস আর একবার কাণ্ডটা করল। এবার একটু বেশী সময় নিয়ে। তার মুখের লালাতে ঠোঁট ভিজে গেল সীতার। তবু ভালই লাগল। একটু কাঁটা হয়ে রইল সে, ট্যাক্সিওলাটার জন্য। কিন্তু শরীরে এক ধরনের উত্তাপ ছড়িয়ে গেল। নতুন মানুষটিরই উত্তাপ। সীতা বুঝে যাচ্ছিল, সে পারবে! এরকম আত্মবিশ্বাসী, সাহসী, সরল ব্যবহারের মানুষ সে তো আগে দেখে নি। এর অভ্যাসকে নিজের অভ্যাস করে নেওয়া শক্ত নয়। সীতা জানে ট্যাক্সিওয়লাটা দেখেছে সবই, ভয়ে কিছু বলছে না। নিখুঁত চালিয়ে নিচ্ছে গাড়ি।

—বড় রেস্তরায় যাবো না, কেমন? মানস বলে, স্বরে গাঢ় ভালবাসা।

—যা তোমার খুশি।

—বড় রেস্তরায় ভীড় কথা হয় না।

সীতা মৃদু প্রশ্রয়ের হাসি হেসে বলে কথা তো হয়েই গেল!

—কী কথা হলো।

—এই যে, যা করলে, এটাও তো কথাই।

মানস হাসল খুব। একটু অন্ধকার এখন। তাই মানসের হরিণ চোখজোড়া দেখতে পাচ্ছে না সীতা। দেখতে ইচ্ছে করছিল খুব।

গড়ের ময়দান ছেড়ে চৌরঙ্গীতে পড়তেই রাস্তার আলো অপস্রিয়মান উজ্জ্বলতা ফেলছিল গাড়ির মধ্যে। এই আলো, সেই আলো, লাল-সবুজ-সাদা। সেই সব আলোতে পলকে পলকে মুখখানা পাল্টে যায়। মানসের মুখ খুব কাছে। ভাল দেখা যাচ্ছে না। ভালবাসায় স্নেহে ওর মাথায় হাত রাখল সীতা। ওর হরিণ চোখ একবার আলোকে স্পষ্ট, আবার অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। সীতা নিবিড় চোখে দেখে।

—চুল উঠে যাচ্ছে বুঝি? মানসের মাথার চুল নেড়ে সীতা বলল।

—প্রায়। টাক পড়ে যাবে শীগ্‌গির। তার আগে টোপর না পরলে···

—টোপর? একটু অবাক গলায় সীতা বলে।

—নয় কেন?

—টোপর পরা মানে তো সামাজিক বিয়ে, তা কী হবে?

—হবে না কেন? একটু অস্বস্তির গলায় মানস বলে।

সীতা হাসল একটু, বিষণ্ণ হাসিটি। বলল—তা কী হয়? কুমারী মেয়েরই সম্প্রদান হয়।

মানস হেলে পড়েছিল সীতার গায়ে, উঠে বসল।

—না হয় রেজিস্ট্রীই হলো। টোপর পরাটা না হয় এ জন্মে বাদ দিলাম।

সীতা হঠাৎ তার চোখভরা জল টের পেয়ে আঁচল তুলল চোখে, বলল—টোপর পরার শখ থাকলে না হয় আমি সরে যাই···

—কী বলে রে মেয়েটা? এঃ মা, কাঁদছো? বলে মানস দু'হাতে তাকে টেনে নেয়। এবং তখন মানসের শরীরের

মাখনের মতো নরম এবং লোহার মতো শক্ত দু'রকম পেশীর অস্তিত্ব টের পায় সীতা। একটু কাঁদে এলিয়ে থেকে, কথা বলে না।

—কাঁদে না, কাঁদে না। টোপরটা তো ঠাট্টার কথা, আজকাল কেউ পরতেই চায় না। মানস আকুল গলায় বলে।

—না। তা কেন? বিয়েতে আলো, সানাই, টোপর-সিঁথিমোর, কড়িখেলা এ সবের একটা আলাদা স্বাদ। অনেকে বিয়ে বলতে এ সব ভাবে। তুমিও ভাবো।

—কে বলল?

—আমি জানি।

—আমার বয়স কত জানো?

—কত?

—একত্রিশ। এ বয়সে যে রোমাঞ্চ টোমাঞ্চ সব ঝরে যেতে থাকে। আমি স্বপ্ন দেখি না।

—শুভদৃষ্টির কথাও কখনো ভাবো না?

—ওসব নিয়ে ভাববার সময় কোথায়?

—আর ফুলশয্যা?

—তুমি ঠাট্টা করছো।

—না গো।

—শোনো, আমি বড্ড ব্যস্ত মানুষ। সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াই। তিন-চার-বার ইউরোপ, ফার ইস্ট ঘুরেছি। অনেক দেখতে দেখতে আর অনেক বাস্তবতার মধ্যে আমার ওসব সংস্কার কেটে গেছে। লক্ষ্মীটি, একদম ভেবো না। আমি সত্যি ঠাট্টা করছিলাম।

আর তখন সীতার ভাল লাগছিল খুব, মস্ত বুকে হেলান দিয়ে বসে থাকতে। সে মনে মনে হিসেব করে দেখল, যদি মানসের একত্রিশ হয়, মনোরমের এখন ছত্রিশ এবং মানস তার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোটো। সীতা কলকাতার রাস্তায় একটা বিজ্ঞাপনের হেডিং দেখেছে প্রায়ই—গেট ইওরসেলফ্ এ ইয়ং হাজ্ব্যাণ্ড।

সে-কথাটা ভাবতে ভাবতে সে হঠাৎ আস্তে বলল—আই অ্যাম গেটিং···

—কী?

—এ ইয়ংগার হাজব্যাণ্ড। বলে হাসল সীতা, সম্মোহিতের হাসি।

মানসের সাহসী ও সরল হাত একটু ওপরে উঠেছে তখন। বুকে।

ট্যাক্সিওয়ালা পার্ক ষ্ট্রীটের ট্র্যাফিক সিগন্যাল পার হয়ে সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে বলল—কোথায় যাবেন?

—চৌরঙ্গী মার্কেট। মানস ভেবে রেখেছিল জায়গাটা। চট করে বলল। ভাবল না। এবং যেখানে হাত ছিল সেখানেই রেখে দিল। সরাল না।

বড় অবাক-করা সাহস ওর। সীতা ঠিক এরকমই চেয়েছিল।

সুরেন ব্যানার্জি রোডে ট্যাক্সি ছেড়ে ওরা ঢুকল চৌরঙ্গী মার্কেটে। ছোট্ট ছিমছাম একটা রেস্তরাঁ। খদ্দের নেই।

অনেক খাবারের অর্ডার দিল মানস। দইবড়া, চপ, ঘুগ্‌নী।

—আর কী খাবে?

—আরো চোখ কপালে তোলে সীতা।

—খাও না বলেই তুমি রোগা।

সীতা মুখে রুমাল চেপে স্রোতস্বিনীর মতো হাসে—মেয়েরা অত খায় না মশাই!

—কারো খাওয়া দেখলে তুমি ঘেন্না পাও না তো? অনেকে পায়।

—যাঃ! যে খেতে পারে সে খাবে না কেন? ঘেন্নার কী?

—আমার বাসায় তো বড় পরিবার। সেখানে অনেকে আছে যারা আমার খাওয়া দেখতে পারে না।

—আমি পারবো। ভয় নেই।

সেই তৃপ্তির হাসিটা আবার হাসে মানস। চৌকো থুতনি

আর চোয়ালে হাসিটা খুব জোরালো দেখায়। ঝকঝকে সাজানো দাঁত। মুখে খুব সুন্দর একটা সুস্থতার গন্ধ পেয়েছিল সীতা, চুমুর সময়ে। হরিণ চোখ, তাতে দীর্ঘ পাতা। এত জোরালো মুখে চোখ দুটো বড় বেমানান রকমের মায়াবী। 'বড় পরিবার' কথাটা সীতার মনের মধ্যে নড়ছিল। একটু সময় নিল সে, বলল—বিয়ের পর তোমার পরিবারের কে কী বলবে?

—বললেই শুনছে কে? আমি তো গভর্নমেন্টের ফ্ল্যাট পেয়েই গেছি ভাবাতলায়। অগাস্টে অ্যালটমেন্ট, তুমি তো জানো।

আলাদা থাকাটাই তো সব নয়। সম্পর্ক তো থাকবেই। আর যাতায়াতও।

—সব সম্পর্ক কেটে দিচ্ছি।

—কেন?

— কেটে না দিয়ে উপায় কী?

সীতা আবার সংশয়ের যন্ত্রণা ভোগ করে বলে—কেন কেটে দিচ্ছো? আমার জন্যই তো!

—ঠিক তা নয়। তবে তোমাকে নিয়ে আলাদা থাকতে চাই। একদম আলাদা আর একা।

—কেন? প্রশ্ন করেই আবার সীতার ঠোঁট কেঁপে ওঠে। চোখে জল চলে আসতে থাকে। আজকাল তার এরকম হয়। ছন্নছাড়া, কারণহীন কান্না পায়। খুব কী বেশী অভিমানী হয়ে গেছে সে?

মানস তার হরিণ চোখ দু'খানা সম্পূর্ণ মেলে চেয়ে থাকে। তারপর হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর পড়ে-থাকা সীতার একখানা হাত চেপে ধরে বলে ও কী! সীতা।

মুখোমুখি বসে ছিল তারা। মানস উঠে সীতার পাশে এসে বসল, কাঁধের ওপর হাত রেখে বলল—কী হলো হঠাৎ?

—আমার জন্যই তুমি পরিবার ছাড়ছো তো!

—কে বলল?

—বলতে হয় না, টের পাওয়া যায়।

—কিছু জানো না। আমরা কি সুখী পরিবারে বাস করি? ছোট্ট বাসা, জায়গা নেই, রোজ ঝগড়াঝাঁটি, সে এক বিচ্ছিরি পরিবেশ। আমার মা-বাবা নেই, শুধু দুই ভাই, তিন কাকা কাকীমা আর খুড়তুতো ভাইবোনদের সঙ্গে থাকি। পিছুটানও কিছুই না। ও সংসার তো একদিন ছাড়তে হতোই! আমি অনেকদিন ধরে ঠিক করে রেখেছিলাম যে, বিয়ের পরই আলাদা হবো। বিশ্বাস করো।

সীতা সামলে গেল। হাসলও একটু। বলল—আমার সব সময়ে কেন যে কান্না পায়!

—কেন কান্না পাবে? আমরা খুব সুখী হবো, দেখো।

—কী করে বুঝলে?

আবেগভরে মানস বলে—আমি তোমাকে সুখী করবই। প্রতিজ্ঞা।

হাল্কা হাসি হাসছিল সীতা, বলল—গায়ের জোরে?

সে কথার উত্তর না দিয়ে অন্য কথা বলে মানস—শুধু তোমার নামটা পাল্টে দেবো।

—কেন?

—ও নামে তোমাকে ডাকতে আমার ভাল লাগে না।

—কেন গো?

—মনোরম ডাকত।

—তাতে কী? মানুষের তো একটাই নাম, সবাই ডাকে।

—তাতে মজা নেই। আলাদা নামে ডাকলেই মজা।

—নাম নিয়ে তুমি একটা কিছু ভেবেছো নিশ্চয়ই?

—ভেবেছি।

—কী?

'সীতা' নামটার জন্যই তুমি অত দুঃখী-দুঃখী ভাব করে থাকো। যেন চারধারে তোমার অশোকবন, রাক্ষসের পাহারা, যেন

নির্বাসনে আছো।

'অশোকবন' কথাটায় একটা বিস্মৃতপ্রায় বনভূমির ছায়া সীতার চোখের ওপর দুলে গেল বুঝি? এক পলকের অন্যমনস্কতা কাটিয়ে সে বলল—ডেকো! যে-নামে খুশী।

—আমি ভেবে রেখেছি।

—কী?

—মৌ।

সীতা একটু অবাক হয়ে আবার হেসে ফেলে—বেশ এক অক্ষরের নাম তো?

—ভাল নয়?

—তুমি যে নাম দেবে, তাই ভাল।

—না। তোমার পছন্দ হয়নি?

—হয়েছে। ডাকলে কেউ ভুল করে শুনবে 'বৌ' বলে ডাকছ।

—আসলে তো তাই ডাকা। মৌ মানে মধু।

—জানি।

—বাংলার বধূ, বুকে তার মধু, পড়ো নি?

—জানি। সীতা স্মিত মুখে মুখ তুলে মানসের মুখে চেয়ে থাকে।

নিঃশব্দ পায়ে হঠাৎ বেয়ারা খাবার রেখে যায়।

—খাও। মানস গাঢ় চোখে তাকিয়ে বলে।

—আর কী খিদে থাকে?

—কেন?

—থাকে না গো। ভিতরটা আনন্দে ফেটে পড়ছে।

মানস খুব খুশী হয়। ভারী বোকার মতো হাসতেই থাকে। অকপট হাসি। একটু ঘন হয়ে আসে। সীতা ঘুগনির বাটিতে চামচ ডোবায়।

—ঝাল। মানস বলল।

—ঝালই তো ভাল।

—আমি ঝাল খেতে পারি না।

—তবে তোমাকে রোজ শুক্তুনী রেঁধে দেবো।

—আমি খাই ফ্যানসুদ্ধ ভাত, লাল আটার রুটি, খোসাসুদ্ধ তরকারী, কাঁচা সব্জী।

—ভিটামিন?

—ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, প্রোটিন, ক্যালোরী। আমার কখনো অসুখ হয় না।

—বলতে নেই।

কী?

—'অসুখ হয় না' বলতে নেই।

—বলব না তাহলে।

সীতা ঘুগনির সুন্দর স্বাদ জিভে নিয়ে উজ্জ্বল চোখে মানসের দিকে তাকাল। সে সুখী হবে।

—আমার শুধু একটা ভয়। সীতা মুখ টিপে বলল।

—কিসের ভয়?

—আমার একটা অতীত আছে।

—তাতে কী?

—কোনোদিন যদি ও কিছু করে? যদি পিছু নেয়, যদি প্রতিশোধ নেয়?

ভ্রূ কুচকে চেয়েছিল মানস। প্রবল হাতে হঠাৎ সীতার হাতটা চেপে ধরে বলল—তাহলে ও আমার হাতে শেষ হয়ে যাবে।

সীতা ততটা উদ্বেগে নয়, যতটা ঠাট্টার গলায় বলল—ভয় তোমাকেও।

—কেন?

—যদি কখনো তোমার মনে কিছু হয়?

তক্ষুনি আবেগে মানস প্রায় সীতাকে বুকে টেনে নিতে যাচ্ছিল। রেস্তোরা বলে পারল না। কিন্তু তার মুখচোখ লাল হয়ে গেল উত্তেজনায়, আবেগে, ভালবাসায়। প্রায় বুজে-যাওয়া গলায়

বলল—কোনোদিন না। তুমি এসব কী বলছো? আমি তোমার জন্য—তোমার জন্য—বলতে বলতে কথা খুঁজে না পেয়ে মানস রুমাল বের করে মুখ মুছল।

পুরুষকে পাগল করার আয়ুধগুলি মেয়েদের প্রকৃতিদত্ত। এই প্রকাণ্ড মানুষটার শরীরে এখন আর হাড়গোড় নেই। একতাল পিণ্ডের মতো সীতার অভিমান, সংশয় আর ভালবাসার উত্তাপে গলে গলে যাচ্ছে। এখুনি সর্বস্ব দিয়ে দিতে প্রস্তুত। ও এখন সীতার জন্য দশদিন উপোস করতে পারে, খুন করতে পারে, যা খুশি করতে পারে।

সীতা সতর্ক হয়ে গেল। ওকে পাগল করার ইচ্ছে তার নেই। বরং গভীর মায়ায় সীতা বলল—তোমার কথা আমাকে কখনো কিছু বলো না।

মানস আস্তে আস্তে সহজ হয়ে বসল। রেডিওর ঘোষণাকারীর মতো গম্ভীর ঘুমভাঙা সুন্দর গলায় বলল—কী বলব! আমার ছেলেবেলা সুন্দর ছিল না। অল্প বয়সে বাবা মারা গেছে, আমরা দু' ভাই আর মা কাকাদের কাছে ছিলাম। দুঃখে কষ্টেই। কাকারা খারাপ লোক নয়, কাকীমারাও ভাল ব্যবহার করেছে, কিন্তু মা আমাদের শান্তি দেয় নি। স্বামী হারিয়ে মা বড় অভিমানী, খুঁতখুঁতে হয়ে গিয়েছিল। কাকীমাদের বা কাকাদের সঙ্গে একটু কিছু হলেই কাঁদত, বিলাপ করত, আমাদের দুই ভাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত রাস্তায়, বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে বলে। এইভাবেই ক্রমে কাকাদের আর কাকীমাদের ধৈর্য ভেঙে গিয়েছিল। ঝগড়াঝাঁটি অশান্তি। তাই মাকে নিয়ে আলাদা হবো বলে ছেলেবেলা থেকেই চাকরির চেষ্টা করতাম। করেছিও চাকরি। খেলাধুলোয় ভাল ছিলাম বলে স্কুলের শেষ ক্লাসে পড়ার সময় থেকেই চাকরি করেছি। আলাদা বাসা করার মতো টাকা পেতাম না, তবু কিছু টাকা আসত। এইভাবেই বড় হয়েছি। আর কী?

—কখনো স্বপ্ন দেখনি তুমি?

—কিসের স্বপ্ন ?

—অনেকে তো অনেক রকম স্বপ্ন টপ্ন দেখে।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল মানস। ভেবে ভেবে বলল—স্বপ্ন ছাড়া বোধহয় মানুষ নেই। আমিও কি দেখিনি ? অলিম্পিকে যাবো, সোনা আনব—এ সব খুব স্বপ্ন দেখতাম। হলো না। ন্যাশনাল মিট্-এর বার থেকে পড়ে যাই, তারপর আর জিমন্যাস্টিক্সে ফিরে যাওয়া হলো না।

—কখনো মেয়েদের কথা ভাবো নি ?

ম্লান হাসে মানস, বলে—মেয়ে! তাদের কথা চিন্তা করতে সাহসই পেতাম না। মা আর ভাইকে নিয়ে আলাদা একটা বাসা হবে, শুধু সেই চিন্তাই করতাম। মাত্র তো কয়েক বছর আগে রেলে চাকরি পেয়েছি। কিন্তু ক'দিনে মা মরে গেছে। কাকাদের সংসারে কিছু টাকাপয়সা দিই বলে কাকারাও আর ছাড়েনি। রয়ে গেলাম। মেয়েদের চিন্তা প্রথম শুরু হয় তোমাকে দেখে। মনোরম তো একটা ক্রিপল্, ওর মনও সুস্থ নয়। ওর ঘরে তোমাকে দেখে আমার কী যে হতো!

বলে আবার গাঢ় চোখে তাকায় মানস। হঠাৎ গলা নামিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলে—তোমার কিছু হতো না আমাকে দেখে ?

সীতা অস্বস্তি বোধ করল একটু। না, হত না। মনোরম বড় ভুল করেছিল ঐ একটা জায়গায়। মানসকে দেখে কেন কিছু মনে হবে সীতার ? তখন তো সীতা সেই কদমছাঁট চুলওলা মাথাটাকে নিজের বুকের মধ্যে নিতে শিখে গিয়েছিল।

সীতা মৃদুস্বরে একটা মিথ্যে কথা বলল—হতো।

বলে মুখ নামিয়ে নিল টেবিলের উপর। টেবিলে গাঢ় সবুজ রঙের কাচ। তাতে তার আবছা মুখচ্ছবি, ও কি নদীর জলে তার ছায়া ?

—কী হতো ?

—কী জানি! অত কী বলা যায় ?

—বলো না। আমি বুঝে নিয়েছি।

সীতা হাসল।

—চলো, কোথাও যাই।

—কোথায়?

—চলো না।

—রাত হয়ে যাচ্ছে।

—তাতে কী? তোমাকে কেউ কিছু বলবে না।

সীতা চুপ করে বসে থাকে। মাথা নোয়ানো।

—ভয় পাচ্ছো? আমাকে? একটা জীবন আমার সঙ্গেই তো থাকতে হবে।

সীতা একটু চমকায়। ঠিকই তো? ভয়ের কী? বাধ্য মেয়ের মতো সে উঠল।

ট্যাক্সি ধরে তারা এল মস্ত একটা ক্লাব ঘরে। বহু পুরোনো আমলের প্রকাণ্ড ক্লাব, সাহেবরা তৈরী করেছিল। সামনে লন্, তারপর পোর্টিকো, রিসেপশন হল। মানস সীতার হাত ধরে নিয়ে গেল, কোথাও বাধা পেল না, কেউ চেয়েও দেখল না রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। ক্লাব ঘর প্রায় ফাঁকা। দু-চারজন খুব দামী পোশাক পরা লোক গেলাস হাতে বসে আছে, চোখ নিমীলিত।

তারা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। কেউ নেই। একটা ঘরে সারি সারি টেবিল টেনিসের টেবিল পাতা। সব খালি, কেবল একটা টেবিলে দু'জন ক্লান্ত ছেলে একনাগাড়ে খেলে যাচ্ছে। খুট-খাট্-টিঙ শব্দ হচ্ছে। ঘরটা পেরিয়ে তারা আর একটা ঘরে এল। ফাঁকা, আলো জ্বলছে। সুন্দর সাজানো ঘর।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে মুখ ঘোরাল মানস। আর তখনই সীতা হঠাৎ বুঝতে পারল, মানস প্রকৃতিস্থ নেই। ওর চোখ জ্বলজ্বল করছে, মুখে রক্তাভা, ঠোঁট নড়ছে। সীতার একটুও ভয় করল না।

মানস এগিয়ে এসে তার দু'কাঁধ ধরে বলল—একটা কথা…

—বলো।

—আমার কাছে মেয়েরা রহস্যই থেকে গেছে। মানসের গলা কাঁপল।

—জানি।

—আমি মেয়েদের কিছু জানি না। তাদের শরীর…তুমি আমাকে এই এক্সপিরিয়েন্সটা দেবে?

নির্দ্বিধায় সীতা বলে—দেবো।

—এখনই। দ্রুত দৌড়ে গিয়ে দরজার ছিটকিনিটা তুলে দিয়ে এল মানস।

পর মুহূর্তেই তারা পাগল হয়ে যাচ্ছিল। কি জানি না লোক কে জানে, তার ওপর তারা ঘূর্ণী ঝড়ের মতো ওলটপালট খাচ্ছিল।

প্রথম; কিন্তু সীতার এ তো প্রথম নয়, সে তো কুমারী নয়, তার রহস্য দেখেছিল প্রথম আর একজন। বনভূমি পিছনে রেখে একটা ঢালু বেয়ে নেমে এসেছিল এক কৃশ ও সুন্দর পুরুষ; বহুদিন, সে কি বহুদিন হয়ে গেল? সেই পুরুষ মনোরম না হয়ে মানস হতে পারত। হলে সে আজ কত সুখী হতো!

ঝড়টা যখন তাকে ঘিরে ফেটে পড়ছে, তখন সীতা আকুল শ্বাস টানছিল বার বার। কোথাও…কোথাও…কোথাও সামান্য একটু সিগারেটের গন্ধ নেই। নেই কেন? তার পিপাসায় সীতা শুঁকছিল মানসের মুখ, গাল, গলা, শ্বাস। না নেই। কিন্তু একটু সিগারেটের কণামাত্র গন্ধের জন্য বড় পাগল পাগল লাগছিল সীতার। সে অস্ফুট গলায় চেঁচিয়ে বলল—এ রকম নয়। না, না……

বসন খোলার মুহূর্তেই থেমে গেল মানস! একটু উদ্‌ভ্রান্ত সে। কিন্তু চট্ করে নিজেকে সংযত করার অতুলনীয় ক্ষমতার অধিকারী। ঘোলাটে চোখে সে সীতার দিকে চেয়ে বলে—না?

সীতা কষ্টে হাসল একটু। মাথা নেড়ে জানাল, না।

—কেন ?

সীতা উত্তর দিল না।

মানস একপলকে গায়ের জ্বর ঝেড়ে ফেলল। হাসল। বলল—তাহলে থাক। আমার তাড়া নেই।

টিক্ টক্-টুউ শব্দ আসছে। বলটা মেঝেতে লাফিয়ে পড়ল। গড়াল। একটা অস্পষ্ট গলা শোনা গেল—নাইন্ সিক্স··· সাইড আউট। আবার টিক্-টক্-টিক্-টক্ শব্দ।

যখন বেরিয়ে আসছিল তারা তখনো পাশের ঘরে সেই দুটি ক্লান্ত ছেলে ফাঁকা ঘরে একনাগাড়ে টেবিল টেনিস খেলে যাচ্ছে। টিক-টক্ টিক-টক্ টিক-টক্···

আবার ট্যাক্সি। আবছা অন্ধকার। বাইরের আলো নানা রঙ ফেলে যাচ্ছে তাদের ওপর।

—আমার তাড়া নেই।

সীতা একটু হাসল, সাম্রুবিকারের হাসি।

মানস রাগ করে নি, একটু হতাশ হয়েছে বোধহয়। কিন্তু সে কিছু না। আবার বলল—যখন নিমন্ত্রণ করে পাতপিঁড়ি পেড়ে খাওয়াবে, তখনই খাবো।

—কী ?

—তোমাকে।

সীতা হাসে।

—পাতিয়ালায় যাওয়ার আগে আমি বিয়ে করব সীতা।

—আইন ?

—দূর, হাক গে।

সীতা শ্বাস টানে, একটা সুন্দর সিগারেটের গন্ধ আসছে কোথা থেকে। সীতা চেয়ে দেখে, ড্রাইভারের পাশে বসা অ্যাসিস্ট্যান্ট ছেলেটা একটা সিগারেট ধরিয়েছে। বুক ভরে বাতাস টানল সীতা।

বাড়ির সামনে নেমে যাওয়ার আগে সীতা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল

—তুমি সিগারেট খাও না ?

—না। কেন ?

—খাও না কেন ?

মানস বুঝতে না পেরে বলে—আমার কোনো নেশা নেই। সিগারেট খেলে দমের ক্ষতি হয়।

—খুব ক্ষতি ?

মানস হাসল, বলল—কেন, সিগারেট খাওয়া তুমি পছন্দ কর ?

—মাঝে মাঝে খেও, যদি খুব ক্ষতি না হয়।

মানস সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল—খাবো। আমার ঠিক সহ্য হয় না। তবে মাঝে মাঝে খাবো, এবার থেকে। ঠিক আছে ?

সীতা সুন্দর ভালবাসার হাসি হাসল। নেমে যেতে যেতে বলল—খেও। মাঝে মাঝে।

—কাল আসব যখন তোমার কাছে, তখন···

—আচ্ছা।

—যাই।

দাদার ঘরে তখনো মক্কেল আছে। আলো জ্বলছে। কথাবার্তা শুনতে পেল সীতা। সিঁড়িটা অন্ধকার। সীতা পা টিপে টিপে উঠে এল দোতলায়।

বারান্দায় আলো জ্বলছে। বউদি রেলিং থেকে ঝুঁকে আকাশ দেখছে। এ সময়টায় বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়ে বউদি রোজই সিঁড়ির মুখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে, যতক্ষণ দাদা উঠে না আসে। দ্বিতীয় পক্ষের বউ, তাই এখনো স্বামীর জন্য আগ্রহ শেষ হয়নি।

—ঠাকুরঝি এলে ?

—হুঁ।

—কত রাত হলো ! প্রায় সাড়ে দশটা।

—একটু ঘুরে এলাম। ঘরে ভাল লাগে না।

—কোথায় ?

—অনেক জায়গায়।

—একা ?

সীতা ভ্রূ কোঁচকাল। বউদির বয়স কম। কৌতূহল বড্ড বেশী।

সীতা বলল—না। দু'জন।

—আর কে ?

—তুমি চিনবে না।

—তোমার ভাই ভীষণ সাহস।

সীতা একটু বিরক্ত হয়ে বলল—বউদি, আমি সধবাও নই, কুমারীও নই, আমি হিসেবের বাইরের মানুষ। আমার জন্য কারো কিছু এসে যায় না।

—তা অবশ্য ঠিক। বলে বউদি চুপ করে যায়। তারপরই হঠাৎ প্রসঙ্গটা ঝেড়ে ফেলে বলল—দেখো না, বৃষ্টি এসে গেল প্রায়, তবু মক্কেলগুলো যাচ্ছে না।

এই ছেলেমানুষীটুকুর জন্যই বউদিটাকে খারাপ লাগে না সীতার। দাদার আগের পক্ষের একটা ছেলে, বিলু। দার্জিলিঙে স্কুলে পড়ে। দাদা ইচ্ছে করেই সরিয়ে দিয়েছে তাকে, যাতে সংমায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল থাকে। কিন্তু দরকার ছিল না। বিলুকে ভালই বাসে বউদি। প্রতি সপ্তাহে চিঠি দেয়। মা-মরা ছেলেটার জন্য কাঁদেও মাঝে মাঝে।

এ সময়ে বাড়িটা নিঃঝুম। বাবা তার ঘরে শুয়ে পড়েছে ন'টায়।

সীতার একটু ক্লান্তি লাগছিল। কিন্তু মনে কোনো অবসাদ নেই। সেখানে রঙীন আলো জ্বলছে।

ঘরে এসে টিউবলাইটটা জ্বালে সীতা। তার একার ঘর ফাঁকা, নিঃঝুম চারদিক। কাপড় না-ছেড়েই বিছানায় গড়িয়ে

পড়ে। একটু শুয়ে থাকে চোখ বুজে। ঝোড়ো বিকেলটার কথা মনে করার চেষ্টা করে। মাথাটা টিপ-টিপ করছে। অনেকদিন বাদে এত চুমুতে ঠোঁট ফুলে আছে সীতার। ভারী লাগছে, ডান গালে কামড় দিয়েছিল মানস, তার জ্বালা। চোখ বুজে একটু হাসে সীতা। গা এলিয়ে দেয়। পুরুষের মতো একটা প্রবল বাতাস আসে, ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘরে। জলকণা মেশানো বাতাস। ঠাণ্ডা। আজ রাতে কিছু খাবে না সীতা, কাপড় ছাড়বে না, ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমোবে? না, ঘুম আসবে না ঠিক। আজ এতদিনের মধ্যে প্রথম মানস এতটা এগোলো। শরীরের কাছে শরীরের কত কথা জমে থাকে। মুখ টিপে সীতা আবার হাসে। হঠাৎ ঝড়ে একটা জানালার পাল্লা ঠাস করে শব্দ করে। একটু চমকায় সে। জানালাটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত, কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছে না। ঘর ভিজে যাচ্ছে হ্যাচলায়, ভিজুক গে। চোখ বুজে একটা ঝিমঝিমানির মধ্যে চলে যাচ্ছিল সীতা। হঠাৎ শুনতে পেল ফাঁকা হলঘরে দু'জন ক্লান্ত ছেলে টেবিল টেনিস খেলছে। টিক-টক-টিক-টক·· টিক-টক···

চমকে চোখ মেলে চায় সে। ধু-ধু আলো জ্বলছে ঘরে। নীল পর্দা কি ওটা? নীলই তো! পর্দাটা উড়ছে হাওয়ায়। সীতা সমস্তটা মন নিয়ে উঠে বসে। পর্দার ওপাশে কী?

কিছু না। অন্ধকার। বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে বারান্দা, তার রেলিং। অঝোর বৃষ্টি।

সীতা হাতমুখ ধুয়ে এসে বাতি নেবাল। দরজা দিয়ে শুয়ে পড়ল। নির্ঘুম চোখে তার মনে পড়ল, মনোরমের আর কিছুই নেই।

বিয়ের পরই চাকরি ছেড়ে সীতার নামে এজেন্সিটা নিয়েছিল মনোরম। হঠাৎ বাজারে নতুন ধরনের অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী জিনিসপত্রের চাহিদা দেখা দিয়েছিল। বড়লোক না হলেও ঢের টাকা রোজগার করেছিল সে। টাকা রাখত লকারে, আয়কর

ফাঁকি দিতে সোনা কিনেছিল অনেক। জমি কিনেছিল। সবই সীতার নামে। ঠাট্টা করে বলত—আমি হচ্ছি সীতা ব্যানার্জির ম্যানেজার। সবাই তাই জানে।

সীতা কোনো খোঁজখবর রাখত না। মাঝেমধ্যে কাগজপত্রে আর চেকে সই দিত, লকার খুলতে তাকেই নিয়ে যেত মনোরম। ব্যাঙ্কে তাদের লকার খুলবার যে কোড্ ব্যবহার করত তা ছিল 'লাভ'। এখনো লকারটা সীতার নামেই আছে। মাঝে মাঝে সে যায় লকার খুলতে, এখনো। কোড্ বলে—'লাভ'। বলবার সময়ে কিছু কি মনে হয়?

ডিভোর্সের সময়ে সে ব্যবসাটা ছেড়ে দিতে চেয়েছিল মনোরমকে। দাদা ছাড়তে দেয়নি। বলেছে, ও পুরুষ মানুষ, ভবিষ্যতে আবার দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু তুই মেয়ে, তোর নামে কোম্পানি, ও কেউ না। এবং আইনমাফিক ম্যানেজারের চাকরি থেকে সীতা মনোরম ব্যানার্জিকে বরখাস্ত করে। তারপর থেকে দাদাই কোম্পানি দেখে, চালায়। লকারে টাকা, সোনা, যাদবপুরে সেন্ট্রাল রোড-এ জমি, সব নিয়ে সীতার কোনো ভাবনা নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়, এভাবে মনোরমকে নিংড়ে না নিলেও হতো।

বাইরে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির শব্দ হতে থাকে আধোঘুমে সীতা শুনতে পায়, ফাঁকা ঘরে দুই ক্লান্ত খেলোয়াড়ের একটানা টেবিল টেনিস খেলার শব্দ। টিক-টক...টিক-টক... টিক-টক...

॥ তিন ॥

আমি এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়ব।

আমি উল্টে রেখেছি বই, আলো নিবিয়ে দিয়েছি। এখন আর কাটলেই আমার কিছু করার নেই। আমার মাথার নীচে একটিমাত্র শক্ত বালিশ, বিছানাটা একটু স্যাঁতসেঁতে, বেডকভারটা ময়লা। তা হোক, তাতে কিছু এসে যায় না। আমি এই একটু ভেজা ভেজা বিছানায়, ময়লা চাদরে চিৎ ঘুমিয়ে পড়ব।

শুভরাত্রি হে আমার টেবিল ল্যাম্প। হাতঘড়ি, বিদায়। বিদায় সিগারেট। কাল আবার দেখা হবে। বিদায়, জেমস বণ্ড। কাল আবার দেখা হবে সমুদ্রের তীরে, বিকিনি পরা ওই মেয়েটি—কী যেন নাম—তার পাশে। শুভরাত্রি হে আমার দেয়ালের ক্যালেণ্ডারের ছবি। শুভরাত্রি হে আমার জানালার পাশে বকুল গাছ। রাত্রির আকাশ, বিদায়। আমি মনোরম, তোমাদের মনোরম, এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়ব। না, ভুল···ভুল বললাম, ঘুমের আগে এই যে একটু সময়—যখন সমস্ত শরীরে রিমঝিম করে নেমে আসছে চেতনাহীনতা, যখন শ্রবণ জুড়ে কেবল ঝিঁঝি পোকার ডাক—তখন এই সময়টুকুতে আমি আর মনোরম নই, তখন আমি এক শিশু ছেলে, যার ডাকনাম ছিল ঝুনু। মা আর বাবার সেই ছোট্ট ঝুনু। বারো মাস অসুখে ভুগে যার রক্তহীন, সাদা, রোগা ডিগডিগে চেহারা। ডান হাতে মাদুলি, গলায় কবচ। এখন আমি সেই ছোট্ট ঝুনু—একটু নির্বোধ, আর একটু অসহায়!···কেউ কিছু বলছো? না, আমার আর কিছুই দরকার হবে না। মানুষ ঠিক ঘুমিয়ে পড়ে। ওই তো ঘুম আসছে ডাকপিওনের মতো! সে আমাদের গলির মুখের ল্যাম্প-পোস্ট

পার হয়ে এল। হাইড্র্যান্টের জল উপচে রাস্তা বুঝি একাকার! সে বেড়ালের মতো লাফ দিয়ে জলময় জায়গাটুকু পার হয়। এখন সে সদরে, রাস্তার মৃদু আলো ঠিক জ্যোৎস্নার মতো পড়ল তার অস্পষ্ট মুখে। শেষ-হওয়া সিগারেটের অংশটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। উঠে আসছে নিঃশব্দে। দরজার বাইরে পাপোষে সে তার জুতোয় লেগে থাকা অন্ধকারের কণাগুলি মুছে নিচ্ছে। হাঁসের মতো গা ঝাড়া দিয়ে সে শরীর থেকে জলকণার মতো ঝেড়ে ফেলছে অন্ধকার। এখন সে ঘরের মধ্যে। কব্জী উল্টে ঘড়ি দেখে সে বলল—ভাবনা চিন্তা করার সময় আর অল্পই আছে।

জানি, আমি তা জানি। আমার জানালার পাশে বকুলের ডালপালায় খেলছে বাতাস। কোন্ দূরের রাস্তায় ঠুন-ঠুন করে চলে যাচ্ছে একজন একা রিক্‌শাওয়ালা। কোথায় যেন ট্যাক্সির মিটার জলতরঙ্গের মতো টুং-টাং ঘুরে গেল। বালিশের নীচে টিক টিক শব্দ করছে আমার হাতঘড়ি। বিদায় হে রাতের শব্দরা। হে কোমল অন্ধকার, শুভরাত্রি। শুভরাত্রি হে আমার জানালার আলো। শুভরাত্রি হে দেয়ালের অচেনা ছায়ারা। বিদায় হাতঘড়ি, বিদায় ক্যালেণ্ডারের ছবি, বিদায় শেষ সিগারেট। স্বপ্ন ও বাস্তবের মতো দিনশেষে এখন আমি ঘুমিয়ে পড়ব। আসছে ঘুমের অন্ধকার তরঙ্গেরা। একের পর এক। বিদায় হে চিন্তাশক্তি। বিদায় বাস্তবতা। শুভরাত্রি হে স্বাবলম্বন। ওই আমার ঘুম, তার দীর্ঘ আঙুল বাড়িয়ে দিল আমার ভিতরে। সে বোতাম টিপে দিতে থাকে একে একে। আর আমার শরীরের ভিতরে যে অন্ধকার সেইখানে নীল লাল স্বপ্নের মৃদু আলোগুলি জ্বলে ওঠে। সেই আলোতে দেখা যায়, এক জনশূন্য বিশাল প্রেক্ষাগৃহ, তার দেয়ালে দেয়ালে ফ্রেস্কোতে আঁকা আমার শৈশবের ছবি। পর্দার ওপাশে মঞ্চে কারা যেন আসবাব টানাটানি করে দৃশ্যপট সাজাচ্ছে। পর্দা অকস্মাৎ সরে যায়। দেখা যায়, ঘাটের পৈঠার মতো দীর্ঘ টানা

কয়েকটা সিঁড়ি। সেই সিঁড়িতে শ তিনেক ছেলে দাঁড়িয়ে—গাইছে—জয় জগদীশ হরে······

বাইরে কি বৃষ্টি? বৃষ্টিই। ঝড়ের বাতাস দিচ্ছে। পাশ ফিরে শুল মনোরম। তার এলানো হাত পড়ে আছে বিছানায়। বিস্তৃত হাতখানা যতদূর যায় কিছুই স্পর্শ করে না। কেউ নেই। একটু ঠাণ্ডা,* স্যাতসেঁতে বিছানায় পড়ে আছে নিরুপায় হাতখানা। বাইরে ঝড়। কী অঝোর বৃষ্টি! মনোরম সেই বৃষ্টির শব্দ শুনতে পেল না। সে তখন তার শৈশবের স্বপ্ন দেখছিল।

কয়েকদিন বাদে মামার সঙ্গে কানোড়িয়াদের বাড়িতে গিয়েছিল মনোরম। সেখানে কাঠের কাজ হচ্ছে। মনোরম কাঠ চেনে না, প্রতি সি-এফ্‌টি কোনটার কত দাম তা জানে না। আসলে কাঠের ব্যবসায় তার মন নেই। এক একটা ব্যবসা আছে যার নো-হাউ জানতে বিস্তর সময় লেগে যায়। কাঠ হচ্ছে সেই ব্যবসা। 'পুরাতন বাড়ি ভাঙা হইতেছে'—খবরের কাগজে এরকম বিজ্ঞাপন দেখলেই মামা সেখানে মনোরমকে নিয়ে যায়। কড়ি-বরগা দেখেই ধরে ফেলে কোনটা কী কাঠ। সত্তর, আশি, কী একশ, দেড়শ বছরের পুরোনো বাড়ির অভাব নেই কলকাতায়। বিস্তর জমি নিয়ে হাতির মত পড়ে আছে। বড় বড় সব ঘর পুরোনো আমলের। দু' তিন তলা সব বাড়ি, এখনকার দশতলার কাছাকাছি উঁচু। সে সব ভেঙে নতুন ধরনের মাল্টি-স্টোরিড বাড়ি উঠছে, অফিস আর ব্যাঙ্ককে ভাড়া দেওয়ার জন্য। আটটা দশটা ফ্লোর, নতুন ধরনের সব গ্যাজেটস্‌, অ্যামেনিটিস্‌। তাই পুরোনো বাড়ি আর থাকছে না কলকাতায়। পুরোনো বাড়ি, বিশেষ করে সাহেব-বাড়ি হলে তার কাঠ হবে আসল বার্মা-টিক্‌, বাজারে পাওয়া যায় না। সত্তর থেকে দেড়শ বছরের কাঠ, রস মরে ঝুন হয়ে গেছে। চেরাইয়ের পর পালিশ করলে রঙিন কাচের মতো দেখায়। মামা বিস্তর নীলাম ডেকে গোলা ভর্তি করেছে সেই দুর্লভ কাঠে। কাজেই বড়লোকদের বাড়ির কাজ হেসে-খেলে পায় মামা।

ওল্ড বালীগঞ্জে একটা নির্জন রাস্তায় বাড়ি। এখনো বাড়িটা শেষ হয়নি। কানোড়িয়ারা বড় লোক সে তো জানা কথা। কিন্তু কতটা তা ঠিক জানা ছিল না মনোরমের। বাড়িটা দেখে তাক্ লেগে গেল। বেশী বড নয়, বড়জোর পাঁচ সোয়া পাঁচ কাঠা জুড়ে একটা কংক্রীটের স্বপ্ন। সামনে একটা লন্, একধারে টেনিস কোর্ট, সেটা পেরোলে থামহীন একটা গাড়ি বারান্দা—একটা বৃত্তাকার প্রকাণ্ড সিমেন্টের চাক্তি শূন্যে ঝুলে আছে। বৈঠকখানার কোনো দরজাই যেন নেই, এ দেয়াল থেকে ও দেয়াল পর্যন্ত চওড়াচওড়ি হাঁ হয়ে আছে। দরজা নেই নয়। আছে। সে দরজা দেয়ালের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। চারিদিকে কাচ আর কাচ ঘরের একদিকে মেঝেয় একটা মস্ত চৌবাচ্চার মতো ডিপ্রেসন। সেখানে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে গেছে। সেই জায়গাটায় নিখুঁত মাপে ভারী 'কোজি' সোফাসেট তৈরী করে বসানো হচ্ছে। ভিতরের দিকে দোতলায় উঠবার সিঁড়ি একটা প্যাঁচ খাওয়া ঢাল হয়ে উঠে গেছে, সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ আলাদা আলাদা কংক্রীটের স্ল্যাব, জোড়া সিঁড়ি নয়। তিনতলা বাড়ির জন্য বসানো হচ্ছে লিফ্ট। ডানদিকে ঘুরে আরো একটু ভিতরে এগোলে দেখা যায়, ঘরের মধ্যেই ছোট্ট একটা মিনিয়েচার দিঘী—'স্লিপিপুল'। তার ওপারে একটা খেলাঘরের ব্রীজের মতো চমৎকার ব্রীজ। 'স্লিপিপুল'-এর ওপরে ছাদটা কাচের, প্রাকৃতিক আলো আসবার জন্য।

দেখাশুনো করছেন এক মাদ্রাজী ইঞ্জিনীয়ার, তার পরনে সাদা লুঙ্গির মতো কাপড়, সাদা জামা, কপালে তিলক, পায়ে চটি। গম্ভীর এবং শান্ত মানুষ। মুখে কথা প্রায় নেইই। মামার হেডমিস্ত্রি আজ কাজে আসেনি, তার জন্য মামা তাকে বিস্তর কৈফিয়ৎ দিচ্ছিল এখনো জলশূন্য স্লিপিপুলের ধারে দাঁড়িয়ে। ইঞ্জিনীয়ার লোকটা হাতের ব্লু-প্রিন্ট দেখছে, ভ্রূ সামান্য কোঁচকানো, উত্তর দিচ্ছে না। উত্তর পেতে মামার সময় লাগবে বিবেচনা করে

মনোরম উঠে এল ওপরে, চমৎকার সিঁড়িটা বেয়ে। কোনটা ঘর, কোনটা প্যাসেজ, কোনটা বারান্দা কিছু বোঝা যায় না। সবটাই নিস্তব্ধ স্বপ্নদৃশ্যের মতো। এমন কী কত টাকা খরচ হচ্ছে বাড়িটায়, তারও কোনো হিসেব পায় না সে। চার পাঁচ লাখ হতে পারে, বিশ ত্রিশ লাখও হওয়া সম্ভব। আরো বেশী হলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। এখনো সর্বত্র মেঝেয় মার্বেল ঘষা হয়নি, দেয়ালে পলেস্তারা পড়েনি। কোণের দুটো ঘর শেষ হয়েছে, সেখানে মিস্ত্রিরা কাঠের আসবাব বানাচ্ছে। মাঝারি বড়লোকেরা বড় জোর প্রবর্তক বা আমকার থেকে আসবাব কিনে আনে। এরা বাজারী আসবাব কেনে না। ঘরের মাপজোক আর ডিজাইন অনুযায়ী আসবাব তৈরী করিয়ে নেয়। মামা মোটে তিনটে শোওয়ার ঘর আর দরজা জানালার খানিকটা করার কন্ট্রাক্ট পেয়েছে। সেটাও বোধহয় বিশ-ত্রিশ হাজার টাকার।

মনোরমকে দেখে মিস্ত্রিরা কাজ থেকে চোখ তুলে তাকাল। তাদের চোখে ভয়।

রাধু বলল—কী হবে বাবু, হেডমিস্ত্রী আজ এল না!

মনোরম বাড়িটায় ঘুরে সব দেখে কেমন একরকমের হয়ে গিয়েছিল। একটা ছোট্ট জায়গায় এত টাকার কারবার দেখে মাথাটা গরম। একটু ঝেঁঝে বলল—তাতে কী? তোমরা কাজ জানো না!

—জানি গো, কিন্তু সকালে আজ ইঞ্জিনীয়ার সাহেব খুব রাগ করেছে। ভয়ে আমাদের হাত চলছে না। যদি এদিক ওদিক হয়ে যায়।

মনোরম কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বেরিয়ে এল। তিনতলায় উঠল ধীরে ধীরে। অনেক মানুষ খাটছে। কেউ বিড়ি খাচ্ছে না, গল্প করছে না। সব চুপচাপ। চারিদিকে একটা সম্ভ্রম আর ভয়-ভয় ভাব। রাজমিস্ত্রিরা কাজ করতে করতে চোরা-চোখে তাকে দেখল, যেন একটু বেশী মন দিয়ে কাজ করতে লাগল। বাড়ির মালিক কে

তা তারা জানে না। মনোরমের পরনে স্ট্রাইপওলা বেলবট্‌স্‌, গুরু পাঞ্জাবি, চোখে রোদচশমা ইস্পাতের ফ্রেমে। মিস্ত্রিরা বুঝতে পারছে না, এই লোকটা মালিকপক্ষের কেউ কিনা। মনোরম খানিকটা মালিকপক্ষের মতোই অবহেলার ভঙ্গীতে একটু ঘুরে দেখল চারদিক। এ তলায় ঘর বেশী নেই, যা আছে তার চারটে দেয়ালই ঘষা কাচের, মস্ত একটা রুফ-গার্ডেনের প্রস্তুতি চলছে।

লিফ্‌ট্‌ এখনো বসানো হয়নি। কুয়োর মতো গহ্বরটা নেমে গেছে। চতুষ্কোণ, একটু অন্ধকার। দরজা নেই। মনোরম ফাঁকা জায়গাটায় মুখ বাড়িয়ে নীচে তাকাল। হাত-পা শিরশির করে উঠল তার। ভার্টিগো। এক পা পিছিয়ে এল। দেয়াল ধরে দাঁড়াল একটু। জিভটা নড়ছে মুখের ভিতরে। শরীরে একটা সঙ্কোচন। একটা দুর্ঘটনার স্মৃতি কিছুক্ষণের জন্য অন্ধকার করে দিল মাথা।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে তাকাল। কাচের ঘর এবং ছাদের বাগানের সুন্দর বিস্তারটি দেখল। মানুষ কত বড়লোক হয়! তিনতলা বাড়ির জন্য লিফ্‌ট্‌ লাগায়, ছাদে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাগান তৈরী করে, ঘরের মধ্যে বানায় পদ্মসরোবর। ছোকরারা কেন বিপ্লবের কথা শহরের দেওয়াল জুড়ে লেখে, তার একটা অর্থ যেন খুঁজে পায় সে। ডিনামাইট সহজপ্রাপ্য হলে সেও একটা কিছু এক্ষুনি করত। পকেট হাতড়ে সে বের করল সস্তা সিগারেটের প্যাকেট। সাতা চলে যাওয়ার পর তার বাড়িভাড়া বাকী পড়েছে এ পর্যন্ত মোট পাঁচ মাসের। দু'শো কুড়ি টাকার দু'ঘরের ফ্ল্যাট পূর্ণ দাস রোডে। পুরোনো বাড়িওলা একটা আশ্রমকে বাড়িটা দান করেছে। আশ্রমের লোকেরা দুঁদে বাড়িওলা নয়, তার ওপর ধর্মকর্ম করে, তাই ঠিক ঘাড়ে ধাক্কা দিচ্ছে না। কিন্তু গেরুয়াপরা সন্ন্যাসীরা প্রায়ই আসে আজকাল, দেখা করে যায়, মিষ্টি হেসে তার আর্থিক অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করে। মনোরম তাদের ধর্মকথায় টেনে নিয়ে যায়। তারা অস্বস্তি বোধ করে।

পরিপূর্ণ ফুসফুসে সিগারেটের ধোঁয়া ভরে নিল মনোরম। মাথাটা ঝিম্ করে ওঠে। সমস্ত শরীর একটা রহস্যময় আনন্দে ভরে যায়। আকাশ টেরিলিনের মতো মসৃণ এবং নীল। শুধু এক কোণে ময়লা রুমালের মতো একখণ্ড বেমানান মেঘ। রুফ্ গার্ডেনের রেলিঙে হাত রেখে মনোরম একটু দাঁড়িয়ে থাকে। দমকা বাতাসে দ্রুত পুড়ে যাচ্ছে সিগারেট। সে একটু শ্বাস ফেলে নেমে এল।

অনেকক্ষণ চেষ্টায় মামা মাদ্রাজী ইঞ্জিনীয়ারটিকে কেবল মাথা নাড়ানোয় সফল হয়েছে। কথা ফোটেনি। দূর থেকে দৃশ্যটা দেখল মনোরম, লিফ্টের কুয়োর মধ্যে ছুঁড়ে দিল সিগারেট। এগোলো।

—মাই নেফিউ। পরিচয় দিল মামা।

মাদ্রাজী ইঞ্জিনীয়ার এক ঝলক তাকাল মাত্র, রিকগনাইজ করল না।

—টুমরো দি হেডমিস্ত্রি উইল ডেফিনিটলি কাম। ময়মনসিংহের অ্যাকসেন্টে ইংরাজিটা বলল মামা।

ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোক একটু ভ্রু কোঁচকাল মাত্র।

—অলরাইট? মামা জিজ্ঞেস করে।

ভদ্রলোক হাতের প্ল্যানটার দিকে নীরবে তাকিয়ে একটা শ্বাস ছাড়ল।

মামা রুমালে ঘাম মুছে মনোরমের দিকে তাকাল। মনোরম মামার মুখ দেখে বুঝতে পারে, এতক্ষণ মামার খুব খাটুনি গেছে।

লন্ ঘেঁসে মামার দিশি গাড়িটা দাঁড় করানো। তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে একটা ঘন নীল রঙের জাপানী ক্রাউন গাড়ি, তার নীলাভ কাচের ভিতর দিয়ে ভিতরে চমৎকার মেয়ে-শরীরের মতো নরম গদী দেখা যাচ্ছে। কী অ্যারিস্টোক্র্যাট তার ড্যাশবোর্ড আর হুইল। এয়ার কণ্ডিশণ্ড। মনোরম ঝুঁকে গাড়িটা একটু দেখল। ভারী পছন্দ হয়ে গেল তার।

মামা তার গাড়ির লক্ খুলতে খুলতে বলে—সাড়ে চারজন মানুষের জন্য এত ব্যাপার-স্যাপার।

—কারা সাড়ে চারজন ?

—কানোড়িয়ারা। বুড়োবুড়ী ছেলে আর ছেলের বউ। আর বোধহয় একটা বাচ্চা।

—মোটে ?

—তাও ছেলে আর ছেলের বউ চোদ্দবার বিজনেস্ টুর আর হানিমুন করতে ইউরোপ আমেরিকা যাচ্ছে, বুড়োবুড়ীর তীর্থ ক'বার বাই। থাকবেটা কে গুচ্ছের চাকরবাকর ছাড়া ? ঝুমু, মাদ্রাজীরা কেমন লোক হয় ?

—ভালই। জেন্টল্।

—আমিও তো তাই জানি। কিন্তু এ লোকটাকে ঠিক বোঝা যায় না। বিশ মিনিট ধরে বোঝালাম, কিছু বুঝেছে কিনা কে জানে! তোকে নিয়েই হয়েছে আমার মুশকিল, ইংরিজিটা ভালই বলিস, কিন্তু বিজনেসটা একদম বুঝিস না। তোকে দিয়ে যে আমার কী লাভ হবে। ভেবেছিলাম, ইংরিজিটা তোকে দিয়ে বলিয়ে যদি ইম্‌প্রেস করা যায়, কিন্তু তুই বলবি কী ? শুধু ইংরিজিতে কি কিছু হয় ? একটু যদি বুঝতিস্।

দিশি গাড়িটা চলছে। ক্রাউন গাড়িটার ছায়া এখনো মনোরমের চোখে ভাসে। দিশি গাড়িটায় বসে তার মনে হয় সে একটা ইঞ্জিন লাগানো মুড়ির টিনের মধ্যে বসে আছে।

মামার চেহারাটা লম্বা, সুড়ুঙ্গে, মাথা প্রায় গাড়ির ছাদে গিয়ে ঠেকেছে। একটু কুঁজো হয়ে বসে স্টিয়ারিং হুইল ধরে আছে। রোগা বলে গায়ের হাওয়াই শার্ট লটর পটর করে। প্যান্টে পাছার দিকটা টান হয় না মাংসের অভাবে। বছরখানেক আগে প্রথম স্ট্রোক হয়ে গেছে। এখন আর একা বেরোতে সাহস পায় না, মনোরমকে সঙ্গে নেয়।

কানোড়িয়াদের নির্মীয়মাণ বাড়িটার কথা ভাবতে ভাবতে

মনোরম হঠাৎ বলল—ওরা খুব বড়লোক।

—কারা?

—কানোড়িয়ারা।

মামা মন দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে একটা গম্ভীর 'হু' দিল।

তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ মামা তিক্ত গলায় বলে—বাঙালীর ছেলে যে কবে ব্যবসা শিখবে।

মনোরম হাই তোলে। প্রসঙ্গটা আসছে।

—কিছুই তো পারলি না। এজেন্সী পেয়েছিলি, তা সে পরের তৈরী মাল বেচে কমিশন পেতিস। কাঠের কারবার তো তা নয়, এ হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং ইণ্ডাস্ট্রি। কিন্তু তুই শিখছিস কোথায়?

—শিখছি তো। সময় লাগবে।

—নন্‌বেঙ্গলীরা কলকাতায় এসব বাড়ি হাঁকাচ্ছে, গাড়ি দাবড়াচ্ছে। আর তোদের কেবল আলোচনা গবেষণা আর মেয়ে-ছেলেদের মতো ছিচ্‌কাঁদুনে সেন্টিমেন্ট।

—নেতাজী এলে সব ঠিক হয়ে যাবে দেখো। বাঙালী জাগবে।

কথাটা মামার প্রাণের কথা। কিন্তু মনোরমের মুখে শুনতে ঠিক প্রস্তুত ছিল না বলে, মামা রাস্তা থেকে চোখ টপ্‌ করে সরিয়ে একবার মনোরমের মুখ দেখে নেয়। ঠাট্টা কিনা তা বুঝতে চেষ্টা করে।

—ঝুমু!

মনোরম মুখখানা স্বাভাবিক রেখেই বলে—উঁ!

—অবিশ্বাসের কী? বিনা প্রমাণে তো এতগুলো লোক ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না!

—কিন্তু কোনজন? শৌলমারীর সন্ন্যাসী, না গোপবন্ধুনগরে

যাকে দেখা গিয়েছিল সেই সাধু, নাকি রাশিয়াতে চীনা ডেলিগেটদের ছবিতে যে লোকটার আইডেন্টিফিকেশন নিয়ে কথা উঠেছিল, কিংবা নেহরুর অন্তিমশয্যার পাশে যাকে দেখা গিয়েছিল! কোনজন, সেইটেই প্রবলেম।

—যে-ই হোক, তিনি আছেন। মামা একটু অধৈর্যের গলায় বলে। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলে—আর তিনি আছেন সন্ন্যাস নিয়ে।

—কী করে বুঝলে?

—বার্মায় তখন তিনি খুব ব্যস্ত, সেই ব্যস্ততার মধ্যে তাঁর এক সঙ্গী তাঁর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে এক মন্দিরে নিয়ে যায়। মন্দিরে গিয়েই তিনি কাঁদতে থাকেন, তারপর মাটিতে গড়াগড়ি দিতে থাকেন, সঙ্গীকে তিনি পরে বলেছিলেন—জানো না, মন্দির-টন্দির এখন আর আমি যাই না। হাতে অনেক কাজ, মন্দিরে গেলে আমার কাজ পড়ে থাকবে। কিছুই করতে পারব না। কাজ শেষ হোক, তারপর আমি তো সন্ন্যাস নেবোই। সন্ন্যাস তাঁর রক্তে ছিল। আমার কাছে যে বই আর পত্রিকাগুলো আছে তা পড়ে দেখিস, প্রতি সপ্তাহে আমাদের একটা মিট্ হয়, যেতে পারিস।

—আমি অবিশ্বাস করছি না।

—তোমরা জাত-অবিশ্বাসী। তোমাদের জেনারেশন। অবিশ্বাসী বলেই তোমরা কোনো রিলেশন এস্টাব্লিশ করতে পারো না। যে বয়সে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রবল ভালবাসা থাকার কথা, সে বয়সে তোমাদের বিয়ে ভেঙে যায়। দেশপ্রেম তোমাদের কাছে হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার, ট্র্যাডিশন, মরালিটি এসব তোমরা ভেবেও দেখ না। ডিসগাস্টিং।

মনোরম চুপ করেছিল।

একটা সিগারেটের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল মামা মনোরমের দিকে একটা দশ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বলল—এক

প্যাকেট গোল্ডফ্লেক নিয়ে আয়।

—তোমার না সিগারেট বারণ ?

—গোল্ডফ্লেক বারণ নয়। যা। তুই আমাকে অ্যাজিটেট করেছিস।

—মনোরম সিগারেট কিনে এনে দেখে মামা ড্রাইভিং সীট থেকে সরে বসেছে। মাথা এলানো, চোখ বোজা। সিগারেট প্যাকেট আর খুচরো টাকা-পয়সা হাত বাড়িয়ে নিয়ে বলল—তুই চালা। আমার নার্ভ ঠিক নেই।

মনোরম ক্ষীণ একটু হেসে ড্রাইভিং সীটে বসতে বসতে বলে—কেন ?

মামা তেমনি ঘাড় এলিয়ে চোখ বুজে সিগারেট খেল কিছুক্ষণ। আস্তে করে বলল—যা বুঝিস না তা নিয়ে কখনো ঠাট্টা করিস না।

মনোরম গাড়িটা চালাতে চালাতে বলে—মামা, যদি কেউ আসেই কোথাও থেকে, তবে সে এখনো আসছে না কেন ? আমরা তো ঘোর বিপন্ন। সে-ই আসুক তার আসতে আর দেরী করা উচিত নয়।

—আসবে দেখিস। একদিন ভারতবর্ষ শাসন করবে সন্ন্যাসীরা।

মনোরম ভিতরে হাসল। বাইরে মুখখানা স্বাভাবিক।

মামা আবার বলে—বাঙালী-বাঙালী করি, কারণ গত সাতাশ বছর কলকাতায় থেকে আমি কখনো এ শহরটাকে বাঙালীর শহর বলে ভাবতে পারি না। এ শহরটায় কয়েকটা বাঙালী পকেট আছে মাত্র। যে সব জায়গায় ক্যাপিটাল আর বিজনেসের খেলা, সেখানে তারা কোথায় ? ভাল বাড়ি, ভাল গাড়ি, ভাল ইণ্ডাস্ট্রি, তাদের কটা ? এ সব তো নেই-ই, তার ওপর নেই আদর্শবোধ। খাওয়া পরার ধান্ধায় ঘোর ক্ষতি নেই, তার সঙ্গে সমাজ সংসার নিয়ে একটু ভাববি তো ! তুই কোন ভাষায় কথা বলিস, কোন দেশে বসত করিস, এগুলো নিয়ে ভাববি না ? আমি

তো জানি প্রতিটি মানুষ তার নিজের, নিজ পরিবারের, দেশের এবং দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য দায়ী।

মনোরম চুপ করে থাকে। মামার বাঙালীপ্রেমটা পরিচিত মহলে বেশ বিখ্যাত ব্যাপার। দার্জিলিং যাওয়ার সময়ে একবার মামা স্টীমার পেরিয়ে মনিহারিঘাটে ট্রেনে উঠবার সময়ে পুরো একটা কম্পার্টমেণ্টে কেবল বাঙালী বোঝাই করেছিল। ওই রোগা চেহারা, কিন্তু অসামান্য তেজ। দরজা জুড়ে ঠ্যাং ছড়িয়ে মূর্তিমান দাঁড়িয়ে পথ আটকে ছিল মামা। কেউ উঠতে গেলেই প্রশ্ন—আপনি বাঙালী? 'না' বললে হটো, 'হ্যাঁ' বললে ওঠো। মনোরমের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় যে, সে যে মামার কাঠগোলায় কাজ পেয়েছে, তা ভাগ্নে বলে ততটা নয়, যতটা বাঙালী বলে।

—তোর কত টাকা বাড়িভাড়া বাকী পড়েছে বলছিলি? মামা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে।

—পাঁচ মাস।

—তাতে কত দাঁড়াচ্ছে?

—দু' শো কুড়ি টাকা মাসে।

—এগারো শো?

—ও-রকম। তবে আপাতত অর্ধেকটা দিয়ে দিলে একটা আপস করে নেওয়া যায়।

—তা তুই ওখানে আছিস কেন এখনো? আমার বাড়িতে নীচের তলায় অনেকগুলো ঘর ফাঁকা।

—কেন, ফাঁকা কেন? বাঙালী ভাড়াটে পাচ্ছো না?

—তা নয়। আগের ভাড়াটেরা এমনই গোলমাল ঝগড়া-ঝাটি পাকিয়েছিল যে সেই থেকে তোর মামীর হার্ট খারাপ। ভাড়াটে বসাবো না। প্রেস্টিজে না লাগলে চলে আয়।

—দেখি।

—দেখি কী? ভারী মালপত্রগুলো বেচে দে। একটা চৌকী আর দু' চারটে বাক্স হলেই তো তোর ঢের। একা মানুষ।

আবার যদি কখনো সংসার-টংসার করিস তো সে তখন দেখা যাবে।

মনোরম উত্তর দেয় না।

—কী রে? ইচ্ছে নেই? তোর মামী একটু কচালে মানুষ বটে, কিন্তু লোক খারাপ নয়। বড় জোর তোর বউয়ের ব্যাপারে তুচ্ছারটে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করবে। তার বেশী কিছু না। একটা ঘরে পড়ে থাকবি নীচের তলায়, কেউ ডিস্টার্ব করবে না। ছেলেটা তো মানুষ না, মডার্ন বাঙালী। পোশাক বাজিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাবা মরলে গদীতে বসবে। মাথায় কোনো আদর্শ-ফাদর্শ নেই। খেলে বেড়ায়, জলসায় সিনেমায় যায়। তুই থাকলে তবু······

মামা চুপ করে কী একটু ভাবে। বলে—প্রেস্টিজে লাগলে গোলায় থাকতে পারিস। অফিস ঘরখানায় একজন অনায়াসে থাকতে পারে। অবাঙালীরা কত কষ্ট করে কলকাতায় থাকে। এক পশ্চিমা পানওলাকে দেখেছিলাম, হ্যারিসন রোডে মোট বারো ইঞ্চি ডেপথের একটা খোঁদল ভাড়া নিতে পেরেছিল। দেয়ালের গায়ে সেই খোঁদলে কাঠ-ফাট লাগিয়ে ওপরে দোকান, নীচে গেরস্থালী। রাতে ফুটপাথে রান্না করে খেত, শোয়ার সময়ে সেই বারো ইঞ্চি জায়গায় কাৎ হয়ে শুয়ে সামনে কাঠের তক্তা লাগিয়ে নিত পড়ে যাওয়ার ভয়ে। ওই ভাবে দেশে দোতলা বাড়ি করেছিল। তো তুই কেন একা মানুষ দু-ঘরের অত ভাড়ার ফ্লাটে খামোখা থাকবি? টাকা নষ্ট। অন্য কারণেও ওই বাড়ি তোর ছাড়া উচিত।

—কেন?

—ওখানে থাকলেই পুরানো কথা মনে পড়বে, আর হা-হুতাশ করবি। বউমার কোনো খবর পাস?

—না।

মামা একটা শ্বাস ফেলে বলে—বউ নিয়ে ভাবতে হবে, এ আমরা কখনো কল্পনাও করিনি। আমাদের ধারণা ছিল, বিয়ে হলেই বউ

আত্মীয় হয়ে গেল, এক মরা ছাড়া আর কোনো ছাড়ান কাটান নেই। গায়ের চামড়ার মতো হয়ে গেল। পাত কুড়িয়ে খায়, হামলে পড়ে সংসার করে, উচ্চৈঃস্বরে ঝগড়া করে, আবার মায়ের মতো ভালবাসে। বউ চলে যাবে, এ আবার কী কথা রে বাঙালীর বাচ্চা?

দু-চার জায়গায় ঘুরে কাঠগোলায় ফিরতে বেলা গড়িয়ে গেল। মামার ছেলে বীরু বসে আছে। বাপের মতোই লম্বা তবে অতটা সুড়ুঙ্গে রোগা নয়। খেলাধুলো করে বলে ফিট চেহারা। মায়া-দয়াহীন মুখ। মুখে হাসি নেই। গরম বলে জামা খুলে স্যাণ্ডো গেঞ্জী, ফুলপ্যান্ট পরে বসে কাগজপত্র নাড়াচাড়া করছে। এক-মাত্র বংশধর আর গম্ভীর প্রকৃতির বলে মামা ছেলেকে বড্ড ভয় পায়। ছেলেকে বাপেতে বড় একটা কথাবার্তা নেই। বীরুর নিজস্ব একটা ফিয়াট গাড়ি আছে, যেটা নিয়ে মাঝে মাঝে কয়েক দিনের জন্য হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে যায়। সে যাই করুক, ছেলেটির হিসেবী বুদ্ধি প্রখর। আর একটা প্রখর জিনিস হচ্ছে ব্যক্তিত্ব। কর্মচারীরা মামাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা ভক্তি করে আবার মামার কাজে ফাঁকিও দেয়, চেয়েচিন্তে পাওনার বেশী টাকা আদায়ও করে। আর বীরুকে পায় ভয়।

মনোরমকে কী চোখে বীরু দেখে তা কে জানে! মনোরম তা নিয়ে বেশী মাথা ঘামায় না। মনোরম যে বেশীদিন মামার কাঠগোলায় আড়াইশো টাকায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারী করবে না, এটা বীরু বোধহয় জানে। কাজেই সে মনোরমের প্রতি মনোযোগ দেয় না। কথাবার্তা হয়ই না বললে গেলে। তারা যে মামাতো পিসতুতো ভাই, এ সম্পর্কটা বাইরে থেকে বুঝবার উপায় নেই।

সামনের চালাঘরটাই আসলে অফিস। বুড়ো মানুষ ভূপতিচরণ ক্যাশ আগলে বসে থাকে। সামনে পিছনে কাঠ আর কাঠ। দাঁড় করানো, শোয়ানো তক্তা, বীম, টুকরো টাকরা কাঠের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। চালা পেরিয়ে অফিসঘর। নামে মাত্র অফিসঘর

ওটা আসলে মামার জিরোবার জায়গা। ওপরে টিন, কাঠের বেড়া। একটা মজবুত চওড়া বেঞ্চ, তাতে ডানলোপিলোর গদী পাতা, তোয়ালে ঢাকা বালিশ। প্রথম স্ট্রোকের পর এ সব ব্যবস্থা হয়েছে। পিছনে করাতকল থেকে ঘষটানো আওয়াজ আসছে। মিহিন, মিষ্টি শব্দটা মনোরমের বড় ভাল লাগে। ঘুম পেয়ে যায়!

মামা ভূপতিচরণের দিকে একবার তাকায়, ভূপতিচরণ হতাশার ভঙ্গীতে মাথাটা হেলায়। ইঙ্গিতটা মনোরম বোঝে গেছে আজকাল। তার মানে বীরু ক্যাশ থেকে আজও টাকা নিয়েছে। মামা ভিতরের ঘরে ঢুকে যাওয়ার আগে একবার মুখ ফিরিয়ে বলে— রমু, তুই একটু ক্যাশ-এ বোস। ভূপতির সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।

মনোরমকে ক্যাশ বুঝিয়ে দিয়ে ভূপতিচরণ উঠে গেল। মনোরম বসল। মুখোমুখি বীরু। ভ্রূ কুঁচকে ফ্ল্যাট ফাইল খুলে কাগজপত্র দেখছে। একটা চূড়ান্ত অগ্রাহ্যের ভাব তার ভঙ্গীতে। চোখ তুলে তাকাল না। ভিতরের ঘরে এখন বীরুকে নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছে মামার আর ভূপতিচরণের মধ্যে। বীরু বোধ হয় সেটা জানে। কাগজ দেখতে দেখতেই তার মুখে একটা তাচ্ছিল্যের মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। তেইশ চব্বিশ বছর বয়সেই ও বুঝে গেছে, পৃথিবীটা ওর একার।

কপাল। মামার ছেলেটা এরকম না হলে মনোরম চাকরিটা পেত না। সীতা চলে যাওয়ার পর তখনই একটা চাকরি না হলে মনোরমের চলছিল না। ল্যাং ল্যাং করে সারা কলকাতা ঘুরে বেড়াচ্ছিল মনোরম। সেই সময়ে একদিন গ্র্যাণ্ড হোটেলের উল্টোদিকে পার্ক করা গাড়িগুলো আস্তে ধীরে হেঁটে হেঁটে দেখছিল সে। গাড়ি দেখা তার একটা পাশটাইম। জেফির, অষ্টিন, কেম্ব্রিজ, হিলম্যান, প্যাকার্ড কত গাড়ি! দেখে দেখে ফুরোয় না। দেখতে দেখতে প্রতিটি মেকারের গাড়ি তার চেনা

হয়ে গেছে। যে কোনো ছুটন্ত গাড়ি দূর থেকেই দেখে সে বলে দিতে পারে কোন মেকারের। নতুন কোনো গাড়ি কলকাতায় এসেছে কিনা তা দেখার জন্যই সে পার্কিং লট-এ ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ঠিক সে সময়ে একটা ভোঁতা মুখ, বৈশিষ্ট্যহীন দিশি গাড়ির ভিতর থেকে মামা ডাকল—ঝুমু।

চাকরি হয়ে গেল। আত্মীয়তা ঝরে গিয়েছিল অনেক আগেই। মা মাবা গেছে বছর পনেবো, তারপর থেকে আর তেমন দেখাশোনা ছিল না। বড়লোক মামাকে এড়িয়েই চলত মনোরম বরাবর। কাজেই মামা যখন বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাওয়াল এক ছুটির দুপুরে, তারপর বলল—'আমার কারখানায় ঢুকে পড়। কাজটাজ শেখ!' তখনই মনোরম বুঝে গিয়েছিল, এটা চাকরিই। মামা বস্। তার আপত্তির কিছু ছিল না। ক'দিনের মধ্যেই সে বুঝে গিয়েছিল যে সে আসলে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার ট্যানেজার কিছু নয়। সর্বসাকুল্যে জনা ত্রিশেক মিস্তিরি, একজন ক্যাশিয়ার আর একজন ম্যানেজার নিয়ে কাঠের কারবার। কোম্পানি মামীর নামে ম্যানেজার মামা। আর কোনো স্টাফের দরকার হয় না। তবু মনোরমকে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার করা হয়েছে কয়েকটি কারণে। প্রথমত প্রথম স্ট্রোকের পর মামা একা ঘোরাঘুরি করতে ভয় পায়। দু নম্বর, মনোরমের চোস্ত ইংরিজি বলা। আর একটা কারণ হল বীরু। মামার একমাত্র সন্তান, একটু বেশী বয়সে হয়েছিল।

মামা প্রায়ই বলে—বীরুর সঙ্গে তোব এখনো বন্ধুত্ব হয়নি ঝুমু?

—বন্ধুত্ব! একটু অবাক হয়ে মনোরম বলে—না তো! হওয়ার কথাও নয়!

—কেন?

—কী করে হবে? আমার ছত্রিশ, ওর বড় জোর তেইশ। তা ছাড়া···

—কী?

—বন্ধুত্বের দরকারই বা কী?

মামা শ্বাস ফেলে বলে—ঝুমু, তুই ওর সঙ্গে একটু কথা-টথা বলিস। আমি চাই ওর সঙ্গে তোর বন্ধুত্ব হোক।

—এটাও কি চাকরির মধ্যে?

—তোর বড্ড খোঁচানো কথা। চাকরি আবার কী। মামাতো পিসতুতো ভাই তোরা, ভাবসাব থাকাবই তো কথা!

—সব কিছু কি জোর করে হয়? বীরু অন্য ধরনের, আমি অন্য ধরনের।

—ওসব কোনো বাধা নয়। বন্ধুত্ব চাইলেই হয়।

—হয় না মামা।

—তুই তো খুব চালাক চতুর ছিলি বরাবর। তুই ঠিক পারবি।

মনোরম তখনই অবাক হয়েছিল। মামা স্পষ্টই চায় বীরুর সঙ্গে তার মেলামেশা হোক।

আবার একদিন মামা প্রসঙ্গটা তোলে—ঝুমু, তুই যদি আমার ব্যবসাটা বুঝে নিতিস, তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম। তুই শিখে নিয়ে ওকেও শেখাতে পারতিস।

—কার কথা বলছো?

—ঐ হারামজাদা। ওকে আমি কিছু বুঝতে পারি না। কারবারটা আমার জলে যাবে।

—বীরুর কথা বলছো? ও খুব চালাক, চিন্তা কোরো না।

—চিন্তা করব না! বলিস কী?

—ও শিখে নেবে।

—অত সোজা নয় ঝুমু! এত ব্যাপারে ওর ইন্টারেস্ট ছড়ানো যে ও কনসেন্ট্রেট করতেই পারবে না। তাই তোকে বলি, তুই ওর সঙ্গে একটু মেলামেশা কর। ওকে একটু বোঝা। ছাখ যদি ফেরাতে পারিস। আলটিমেটলি আমি ম্যানেজারটা তোকে দেবো,

বীরু থাকবে প্রপ্রাইটার। তোর মামীর সঙ্গে আমার কথা হয়ে আছে।

—ব্যস্ত হচ্ছো কেন! ওকে একটু সময় দাও। বয়স হলে ও ব্যবসায় মন দেবে।

—ব্যস্ত হচ্ছি, আমার শরীরকে আমি ভয় পাই। একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে, আবার কখন কী হয়ে যায়! ওর জন্য চিন্তা করে করে আমি আরো শেষ হয়ে যাচ্ছি।

—এত চিন্তার কী?

—মাসে দু-তিন হাজার টাকা ওর কিসে লাগে বল তো! কোথায় যায়, কী করে কিচ্ছু জানি না। সেইজন্যই চাইছিলাম তুই একটু ছাখ। তোর সেন্স অব রেসপন্সিবিলিটি আছে। বহু লোক দেখেছিস, মিশেছিস। বীরুকে বুঝাতে পারবি না?

মনোরম ব্যাপারটা সেই প্রথম গায়ে মাখে। মাসে দু-তিন হাজার টাকা একজন একা খরচ করে! আর সে নিজে ব্যাঙ্করাপ্ট। বীরুকে তখনই সে মনে মনে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছিল।

মাসে থোক হাতখরচ পায়, তার ওপর মামীও কিছু লুকিয়ে দেয়। তবু বীরু এসে ক্যাশ থেকে টাকা নেয়। নির্দ্বিধায় নেয়, কারো কাছে জবাবদিহি করার কথা ভাবেই না। ছেলেটার এই দ্বিধাহীন ব্যবহারেই বোধহয় মামা ওকে ভয় পায়। চোখে চোখ রাখে না।

—নিচ্ছে নিক, টাকাটা তো শেষ পর্যন্ত ওরই। একথা একদিন বলেছিল মনোরম মামাকে।

—ছাখ ঝুমু, টাকা কারো নয়। যে রাখতে পারে তার লক্ষ্মী, যে ওড়ায় তার বারোই। এই বিতিকিচ্ছিরি চেহারার কাঠগোলার পেছনে কত লাখ টাকার কাজ হচ্ছে তা তো তুই বুঝিস। এত টাকা তো এমনি এমনি হয়নি। এর পেছনে আমার যেমন পরিশ্রম আছে, তেমনি আদর্শবোধও। বাঙালী ব্যবসা জানে না—এ অপবাদ আমি আমার জীবনে ঘুচিয়েছি। আর ঐ হারামজাদা

'বাঙালী' কথাটার অর্থই জানে না, ব্যবসার 'ব' বোঝে না।

—তুমি বলো না ওকে।

—বলব! আমি? ও আমাকে বাড়ির চাকর বাকরের বেশী কিছু মনে করে নাকি? আমার পারসোনালিটি নেই, আমি জানি। পারসোনালিটি ব্যাপারটা হচ্ছে স্ট্রং লাইকস অ্যাণ্ড ডিসলাইকস। আমি কী পছন্দ করি না, কী করি তা ওকে কোনোদিনই বোঝাতে পারিনি। ও যখন ছোটো ছিল, তখন থেকেই ওর মুখের দিকে তাকালেই আমি বরাবর আত্মবিস্মৃত হয়েছি। অন্য ক্ষেত্রে আমার যাও বা একটু ব্যক্তিত্ব আছে, এর কাছে কিছু নেই। আমারই দোষ। কিন্তু এখন কিছু আর করার নেই। যদি তুই কিছু করতে পারিস।

—কী করব?

—আমার ধারণা, ও খুব সেফ লাইফ কাটায় না। ওকে ওয়াচ করা দরকার, গার্ড দেবারও দরকার। কোনদিন কী বিপদ ঘটাবে।

কী বিপদ?

—কে জানে! আমি কী করে বলব? কিছুই জানি না, বলেছি তো। হঠাৎ তিন চার দিনের জন্য না বলে উধাও হয়ে যায়। কখনো-সখনো একমাস কোনো খবর পাই না। ভেবে ভেবে আমার একটা অসহ্য আতঙ্ক তৈরী হয়ে গেছে। কেবলই মনে হয়, শীগগীরই হঠাৎ একদিন ওর বদলে ওর ডেডবডি লোকে ধরাধরি করে বয়ে এনে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাবে···দুর্গা, দুর্গা ···এ সব মনে হয় বলেই আমার স্ট্রোক-টা হয়েছিল।

মনোরম বুঝতে পেরেছিল, তার দায়িত্ব বাড়ছে। একটা শ্বাস ফেলে বলল—তুমি আমাকে কী করতে বলো?

—তুই ওকে মাঝে মাঝে 'ফলো' কর।

—'ফলো'? মাই গু-উ-ডনেস!

—ঝুমু, ওকে ওয়াচ করা দরকার। অন্য উপায় নেই।

—'ফলো' করে কী করব ?

—দেখবি ও কী করে। যদি বিপদে পড়ে তো সামলাস।

—আমি ?

—নয় কেন ?

—আমি পারব না মামা।

—কেন ?

—আমি ঠিক···ঠিক সুস্থ নই। সেই অ্যাকসিডেণ্টের পর আমারও আর আত্মবিশ্বাস নেই। কী যেন একটা হারিয়ে গেছে। আমি ভয় পাই।

—তবে বীরুর কী হবে ঝুমু? আমার যে তুই-ই সবচেয়ে ভরসা ছিলি।

—ফলো-টলো করা খুব রিস্কি মামা। বীরু টের পেলে ?

—বীরু টের পাবে ? মামা চোখ বড় বড় করল।

—পাবে না ?

—তুই কি ভাবিস বীরু চারপাশটাকে লক্ষ্য করে ? করলে আমি ভাবতাম নাকি ? ও যখন গাড়ি চালায় তখন উন্মাদের মতো চালায়, আগুপিছু কিছু লক্ষ্য করে না। কারো তোয়াক্কা নেই. লক্ষ্য করবে কেন ? তুই আমার গাড়িটা নিয়ে সেফলি ফলো করতে পারিস, ও কখনো ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবেই না। গাড়ির নম্বর-প্লেট তো দূরের কথা, আস্ত গাড়িটাকেই ও নজর করবে না। আমি ওকে ফলো করে দেখেছি ঝুমু।

—করেছো ?

—করেছি। কিন্তু পারি না। অত জোরে গাড়ি চালানোর নার্ভ আমার নেই। তা ছাড়া আফটার অল আমার ছেলে, তার সব কিছু ওয়াচ করতে আমার সঙ্কোচ হয়। তোর তো তা নয়।

মনোরমের এই প্রথম মামার জন্য কষ্ট হয়েছিল খুব। যে লোকটা মনিহারিঘাটে একবার কামরার দরজা আটকে কেবল

বাঙালী তুলেছিল গাড়িতে, তার সেই তেজ-টেজ বীরুর কাছে এসে কোথায় মিলিয়ে গেছে। নব্বই পারসেন্ট বাঙালীর চাকরির জন্য যে লোকটা সব লড়াই করতে প্রস্তুত তার এ কেমন ব্যক্তিগত পরাজয়!

মনোরম নিমরাজী হয়েছিল। কাঠগোলায় বসে থাকার চেয়ে বরং একটু খোলা আলো-বাতাসে একা একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়া, ব্যাপারটা ভাবতে ভালই।

একদিন বীরু ক্যাশ থেকে টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেল। সামনেই দাঁড়ানো ওর ফিয়াটখানা। উঠল। গাড়িটা ছাড়তেই, মামা ভিতরঘর থেকে বেরিয়ে এসে চেঁচাল—ঝুমু, ফলো হিম! এই যে গাড়ির চাবি···মামা ছুঁড়ে দিয়েছিল চাবিটা।

মনোরম লুফে নিল। দৌড়ে গিয়ে মামার গাড়িটায় উঠে পড়ল। তখন উত্তেজনায় তার শিরা ছিঁড়ে যাচ্ছে। বুকে স্কুটারের শব্দের মতো ভুড়ভুড় শব্দ। মামার ভোঁতা মুখওলা দিশী গাড়িটা ছাড়ল মনোরম। এবং বুঝতে পারল এ গাড়ি নিয়ে বীরুর বিদেশী ফিয়াট গাড়িটার পিছু নেওয়া বেশ শক্ত। তার ওপর বীরু তার ফিয়াট গাড়ির ইঞ্জিন মেকানিক দিয়ে হট্-আপ করিয়ে নিয়েছে। স্পীডের জন্য।

লেকের ভিতর দিয়ে সাদার্ন অ্যাভিনিউ হয়ে যাচ্ছে গাড়িখানা। ভোঁতা-মুখ দিশী গাড়িটায় বসে দাঁতে দাঁত চাপল মনোরম। জিভটা তখন ধড়াধড় ধাক্কা দিচ্ছে বন্ধ দাঁতে। ঘামছিল মনোরম। গাড়ির গতি বাড়তেই মনে পড়ল সেই দুর্ঘটনা···ছুটন্ত ট্রেন তার লাইন ছেড়ে অসহায় মাঠের মধ্যে নেমে যাচ্ছে—লোভী, কাণ্ড-জ্ঞানহীন, লুঠেরা মানুষেরা ফিস-প্লেট খুলে রেখেছিল, অপেক্ষা করছিল অন্ধকারে··একটা প্রলয় ঝড়ের মধ্যে ট্রেনের কামরার নিরাপদ প্রথম শ্রেণীর বার্থসুদ্ধ মনোরম হঠাৎ এরোপ্লেনের মতো উড়ে যাচ্ছিল। অন্ধকার হয়ে গেল মাথা। আবার ফিরে এল আলো। ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে বীরুর ফিয়াট।

ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছিল মনোরম। দাঁতে দাঁত চেপে ভেবেছিল—নো মোর স্পীড ফর মী। আমি এখন একটা স্লো-মোশান ম্যান। জোকার।

মামা হতাশ হয়নি। বলেছিল—লেগে থাক্। তুই-ই পারবি।

প্রথম প্রথম কয়েকবারই ব্যর্থ হলো মনোরম। অলীক ছায়াছবির মতো মিলিয়ে যায় বাক আর তার ফিয়াট। কলকাতার ভিড়ে ঠিক যাদুকরের মতো বারু তার অদৃশ্য রাস্তা করে নেয়। মনোরম হতাশ হয়। এক রাতে স্বপ্ন দেখল, বারু তার গাড়ি নিয়ে আশি নব্বই মাইল বেগে ছুটছে একটা দেয়ালের দিকে, সুইসাইড করবে। মামার দিশী গাড়িখানা ঝকাং ঝকাং করে মুড়ির টিনের শব্দ করতে করতে চলেছে। গাড়ির রেডিওতে মামার আকুল স্বর শোনা যাচ্ছে—ঝুমু, ওকে বাচা, ঝুমু-উ—। কিন্তু গাড়ি চলছে না। স্বপ্নের মধ্যেই ইডিওমোটর অ্যাকশন হচ্ছিল মনোরমের। বারুর গাড়িটা দেয়ালের ওপর আছড়ে পড়ছে···ঠিক এই অবস্থায় ঘুম ভেঙে দেখল মনোরম, তার হাত ছড়ো সামনে বাড়ানো, একটা পা তোলা। স্বপ্নের মধ্যে সে চিৎকার করেছিল, সেই চিৎকারের শব্দ এখনো তার কানে লেগে আছে। যেন বা নিজের স্বপ্নের চিৎকারেই তার ঘুম ভেঙেছে।

মামার কিছু টাকা খরচ হল। মেকানিক দিয়ে পুরোনো গাড়িখানা একটু 'টট-আপ' করাতে হল। মেকানিক বলল—দিশী মেশিন, খুব বেশী স্পীড তুলবে না।

তারপর একদিন প্রাণপাত করল মনোরম। গাড়ি চালানোর অভ্যাস গেছে বহুদিন। গ্রেবালদের মোটর ট্রেনিং স্কুলে শিখেছিল আশা ছিল, নিজের গাড়ি হবে একদিন। হয়নি। কাজেই অভ্যাসে মরচে পড়ে গেছে। তার ওপর দুর্ঘটনার স্মৃতি, ইডিও-মোটর অ্যাকশন, নড়ন্ত জিভ, সীতা! এতগুলো বাধা তার সব গতি কেড়ে নিচ্ছে আস্তে আস্তে। তবু সে একদিন বারুকে ধরল এক দুপুরে। মামাদের বাড়ির সামনে থেকেই ফিয়াটখানা

ছাড়ল। দশ গজ দূরে মনোরম মামার গাড়ির হুইলের পিছনে প্রকাণ্ড গো-গো চশমা পরে বসে। গাড়িটা চলেছিল সেদিন। মনোরমের বুকে স্কটাব ডেকেছিল, মনে পড়েছিল সেই দুর্ঘটনা, জিভ নড়েছিল, সাতার জন্য দুখিত ছিল হৃদয়। তব বীরুর রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য সেদিন সে বুক দিয়ে চালিয়েছিল গাড়ি। ঘেমে নেয়ে গিয়েছিল সে। বীরুর মায়াবী ককয়াট মুহূর্তে মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। একটু অবহেলায় কাত হয়ে বসেছে বীরু, ডান হাতে আলতো ছুঁয়ে রেখেছে হুইল, ঠোঁটে সিগারেট। চেষ্টাহীন সেই চালানো। বিদেশী মসৃণ গাড়িখানা সিস্বের অলীক রাস্তায় পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। পিছনে দিশী গাড়িখানায় মনোরমের শ্বাস গাঢ় ও দ্রুত হয়ে উঠছে তখন, বোঁযাচ্ছে গোঙানো ইঞ্জিন, ঘাম, স্বপ্ন ও স্মৃতির কুয়াশায় আচ্ছন্ন সম্মুখ। সে কী প্রাণপণে দিক ঠিক রেখেছিল মনোরম। ইনট্যুইশনের ওপর ভর করে বাঁক নিয়েছিল, কারণ বীরু হারিয়ে যাচ্ছিল প্রায়ই। এসপ্ল্যানেডেই যাচ্ছে বীরু—এই আন্দাজে চালিয়ে অবশেষে লেনিন সরণীর মোড়ের ট্রাফিকে সে বীরুর গাড়ির দশখানা গাড়ির পিছনে থামল।

সেদিন বীরু খুব বেশী দূর যায়নি। সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ে ঢুকে একটা চওড়া সম্ভ্রান্ত গলিতে গাড়ি দাঁড় করাল। অবহেলার ভঙ্গিতে নামল, দরজা লক্ না করে এবং গাড়িটার দিকে একবারও পিছু ফিরে না তাকিয়ে ঢুকে গেল একটা মস্ত দোকানে। ধীরে ধীরে দিশী গাড়িটাকে দোকানের সামনে আনল মনোরম। দেখল, রেডিও আর গ্রামোফোনের খুব বড় দোকান। সামনে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত কাচ লাগানো ছুটো শো-কেসে অজস্র রেডিও, গ্রামোফোনের ডিসপ্লে। ঠিক গোয়েন্দার মতো সতর্ক চোখে তাকিয়ে রইল মনোরম। বাইরে দিনের আলো। কাচের গায়ে নানা রকম প্রতিবিম্ব পড়েছে। ওই সব প্রতিবিম্বের জন্য ভিতরটা ভাল দেখা যায় না। তবু প্রাণপণে লক্ষ্য করল মনোরম।

ভিতরের মৃদু আলোয় দেখল, দোকানের ভিতরে আর একটা কাচের পার্টিশন আছে। সেই পার্টিশনের কাচের পাল্লা ঠেলে বীরুর লম্বা চেহারাটা ভিতরে ঢুকে গেল। ঝাঁয়-ঝিক ঝাঁয়-ঝিক ঝাঁয়-ঝিক করে একটা পপ মিউজিক বাজছে ভিতরে। রক্ত গরম করা বাদ্যযন্ত্র। শুনলেই হাত-পা নাচের জন্য দামাল হয়ে ওঠে। কাচের পাল্লাটা খুললেই গাঁক গাঁক করে শব্দটা বেরিয়ে আসছে। পাল্লাটা বন্ধ হলেই শব্দ মৃদু হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অবিরল শব্দটা হয়েই চলেছে।

মনোরম অনেকক্ষণ বসে সিগারেট পোড়াল। তারপর বীরু বেরিয়ে এল। একটা ধৈর্যহীন চাপা উত্তেজনাময় চেহারা তার, অসুখী, অতৃপ্ত। তার পিছনে কয়েকজন লোক ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে এল একটা অত্যন্ত দামী, সুন্দর স্টিরিও সিস্টেম। সেই জিনিসটা গাড়ির পিছনে তুলে আবার গাড়ি ছাড়ে বীরু। মনোরমের আবার সেই প্রাণান্তকর পিছু-নেওয়া। রিচি রোডের একটা চমৎকার অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে, তেমনি দরজা লক্ না করে, পিছু না ফিরে ঢুকে গেল ভিতরে। একটু পরে দু'জন দারোয়ান-চেহারার লোক এসে দুটো বাক্সের মতো স্পিকার আর রেকর্ডপ্লেয়ার সহ স্টিরিওটা নামিয়ে নিয়ে গেল। ধৈর্যশীল মনোরম ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে রইল। বীরুর গাড়িটা হিম হতে লাগল। মনোরম দু'বার পেচ্ছাপ করল, প্রায় দেড় প্যাকেট সিগারেট খেয়ে ফেলল। অনেক রাতে নেমে এল বীরু। শিস দিচ্ছে, একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। বোধহয় কিছুটা মদ খেয়েছে। গাড়িতে উঠে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। ঘুমের ঝিমুনি এসে গিয়েছিল মনোরমের। চটকা ভেঙে সোজা হয়ে বসল। রাত হয়ে গেছে। এত রাতে পিছু নিলে বীরু টের পাবে। ভাবল মনোরম। কিন্তু বীরু কিছু লক্ষ্য করেছে বলে মনে হল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে গাড়িটা ছাড়ল। তেমন স্পীড দিল না এবার। আস্তে ধীরে বাড়ি ফিরে গেল। বীরু

বাড়িতে ঢুকে যাওয়ার আধ ঘণ্টা পর মনোরম দিশী গাড়িটা গ্যারেজে তুলে মামার দারোয়ানের হাতে চাবি দিয়ে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এল। সেই রাতে সাফল্যের আনন্দে তার ভাল ঘুম হয়।

পরদিন মামা সব শুনে ভ্রূ কুঁচকে বলল—অ্যাপার্টমেণ্ট হাউস? ওখানে ও করে কী?

—কে জানে! চেনাশোনা কেউ থাকতে পারে।

—ভাড়া নেয়নি তো?

—কে জানে!

—খোঁজ নে।

—আমি কি ডিটেক্‌টিভ্‌ হয়ে যাচ্ছি মামা?

মামা চিন্তিত মুখ তুলে বলেছিল—তোকে এর জন্য না হয় কিছু বেশী টাকা দেবো। ওকে দেখিস ঝুমু।

দেখেছে মনোরম। খোঁজ নিয়ে জেনেছে, অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসটায় আটশো টাকা ভাড়ায় একটা ফ্ল্যাট নিয়েছে বীরু। মাঝে মাঝে থাকে সেখানে। তবে বেশী কিছু জানা যায়নি। মনোরম অনেক ভেবেছে, বুঝতে পারেনি, কেন বীরু নিজেদের অমন প্রকাণ্ড বাড়ি থাকতে এবং সেখানে অতগুলো খালি ঘর থাকতে একটা অ্যাপার্টমেণ্ট ভাড়া করেছে। মামাও ভেবে পায়নি। দু'জনে চিন্তিতভাবে দু'জনের দিকে চেয়ে থেকেছে। মামা শ্বাস ফেলে বলেছে—ঝুমু, লক্ষ্য রাখিস। আমার একটাই সন্তান।

বীরুর কলেজের সামনেও অপেক্ষা করেছে মনোরম। বিশাল ইউনিভার্সিটি কলেজ। অনেকগুলো বিল্ডিং, করিডোর, মাঠ, ছেলেমেয়ে, ঠিক থৈ পাওয়া মুশকিল। তবু মনোরম ঘাপ্‌টি মেরে ঘুরেছে কলেজের মাঠে, করিডোরে, দালানে। ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে, বীরু তাকে লক্ষ্য করেনি। এক দঙ্গল মেয়ের সাথে করিডোরে প্রায়ই আড্ডা দেয় বীরু। সকলের প্রতি সমান

মনোযোগ। ক্ষতিকর কিছু নয়, একদিন শুধু কলেজ ভেঙে যাওয়ার পর বীরু দেখেছিল, একটা ফাঁকা ক্লাশঘরের দরজার চৌকাঠে বীরু দাঁড়িয়ে। লম্বা শরীরটা ঝুঁকে আছে, দরজার কাঠের ওপর হাত তুলে ভর রেখেছে শরীরের। ওর দীর্ঘ শরীরের আড়ালে একটা চৌখোস, সুন্দর, প্রায় কিশোরী মেয়ে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে। মেয়েটির বয়স এত কম, মুখে এমন একটা নিষ্পাপ ভাব যে, সহজেই যে কেউ প্রেমে পড়তে পারে। মনোরম দেখছিল, বীরু কথা বলতে বলতে ডান হাতে মেয়েটির বাঁ বগলের শর্ট স্লিভ্‌সের ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে কাতুকুতু দিচ্ছে। মেয়েটি হেসে বলছে—যাঃ, রীতা একথা বলতেই পারে না।

—সত্যিই বলেছে, গৌরী প্রেগন্যান্ট।

—রীতাটা মিথ্যুক।

—তাহলে সত্যিটা কী? তুমি প্রেগ্‌ন্যান্ট নও?

—যাঃ! বলে মেয়েটি একটুমাত্র লাজুক ভাব করে খিলখিল হাসল। বলল—একদম ফ্রী আছি বাবা। ভয় নেই।

এইটুকু শুনেছিল মনোরম, সেদিন। ধৈর্যহীন, অতৃপ্ত যুবা বীরু চট করে হাতের ভরটা তুলে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, চলি।

মামাকে এটা জানানো যায় না। জানায়নি সে। বীরু যে ঐ মেয়েটির সঙ্গে প্রেম করছে না, সেটা বোঝা গেল আর একদিন। অপরাহ্ণের ফাঁকা ক্লাশঘরে বসে সে অন্য এক মেয়ের সাথে দ্বৈত রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছিল। একটা উঁচু ডেস্কের দু'ধারে দু'জন, ডেস্কের ওপর নামানো মাথা, থুঁতনিতে থুঁতনি ঠেকে আছে। অনুচ্চ স্বরে, আবেগভরে এবং সুন্দর গলায় দু'জনে গাইছিল—অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ .....সারাক্ষণই গানের মধ্যে তারা পরস্পরকে চুম্বন করেছিল। দেখে ভারি উত্তেজিত হয়েছিল মনোরম। আগের দিনের সেই সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে তাহলে বীরু প্রেম করছে না? কেন করছে না? কী সুন্দর মেয়ে, অনায়াসে মিস্ ক্যালকাটা জিতে যেতে পারে, অমন সুন্দর মেয়ে বীরু

পাবে কোথায়! মেয়েটা ইচ্ছে করলে মনোরমকে সীতার দুঃখ ভুলিয়ে দিতে পারে, আর বীরু ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। হায় ঈশ্বর! প্রেম করবি না তো ওর বগলে তুই কেন হাত দিলি বীরু? কেন জিজ্ঞেস করলি, ও প্রেগন্যান্ট কিনা! ঠাট্টা নয় তো? ঠাট্টা! এরকম ঠাট্টা কোনো মেয়েকে করা যায়, আর এরকম ঠাট্টা শুনে কোনো মেয়ে হাসে, মনোরম জানত না। মাথা গরম হয়ে গেল মনোরমের। তার সামনে একটা উত্তেজক নতুন জগতের ছবি ফুটে উঠছিল।

দক্ষিণ কলকাতার একটা নামকরা গানের স্কুল থেকে একদিন চমৎকার শরীরওলা একটি মেয়েকে গাড়িতে তুলল বীরু। মনোরমের দিশি গাড়িটা এখন প্রায় বীরুর ফিয়াটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চালায়। ইচ্ছে করলে ওভারটেকও করতে পারে। মনোরম লক্ষ্য করে, মেয়েটার নিজের প্রকাণ্ড একখানা হাম্বার গাড়ি আছে। বীরুর গাড়িতে ওঠার আগে মেয়েটি নিজের গাড়ির ড্রাইভারকে গিয়ে নীচু স্বরে কী বলল, গাড়িটা চলে গেল। মেয়েটা জিভ দিয়ে ওপর ঠোঁট চেটে বীরুর পাশে উঠে বসল, খোঁপা ঠিক করল। সহজ ভঙ্গী, বীরু তাকে নিয়ে এল তার অ্যাপার্ট-মেন্টে। দু'জনে নেমে এগিয়ে গিয়েছিল, মেয়েটা হঠাৎ থেমে বলল—ঐ যাঃ! ব্যাগটা ফেলে এসেছি।

—তাতে কী হয়েছে?

—দাঁড়াও না, নিয়ে আসি। ব্যাগটা না থাকলে বড্ড হেল্প-লেস লাগে।

দৌড়ে গাড়ির সীট থেকে ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে মেয়েটা বীরুর সঙ্গে বাড়িটায় ঢুকে গেল।

মাঝে মধ্যেই এটা হতে থাকে। মনোরম একান্তভাবে পিছু নেয়। এবং লক্ষ্য করে, মেয়েটার স্বভাবই হচ্ছে ব্যাগ ফেলে যাওয়া। ক'দিনই মেয়েটা ব্যাগ ফেলে গেল। দু-একবার মনে পড়তে ফিরে এল। অন্য কয়েকবার ব্যাগটা পড়েই রইল

গাড়িতে। ওরা বাড়ি থেকে বেরোতো অন্তত তিন-চার ঘণ্টা পরে। ওরা কী করে এতক্ষণ তা জলের মত পরিষ্কার। অথচ মেয়েটা ভাড়াটে মেয়েমানুষ নয়। তার গাড়ি আছে, যে স্কুলে সে গান শেখে তা খুবই উঁচু জাতের, চেহারা বড় ঘরের মেয়ের মতো। তবে কি বীরু প্রেম করছে অবশেষে? মনোরম দিশি গাড়িটায় বসে ভাবত আর ঘামত।

সাহস বেড়েছিল মনোরমের। কৌতূহলও। মেয়েটা প্রায়ই ব্যাগ ফেলে যায়। একদিন মনোরম থাকতে না পেরে নেমে আসে। চারদিকে চেয়ে দেখে। কেউ লক্ষ্য করে না। সোজা গিয়ে বীরুর লক্-না-করা গাড়ির দরজা খুলে ভিতরে ঢোকে। তুঁতে রঙের ব্যাগটা পড়ে আছে অবহেলায়। সে খোলে। প্রথমে কিছু সাধারণ জিনিস পায়। আইব্রো পেন্সিল, লিপস্টিক, পাউডারের কেস, ফাউণ্ডেশন, ক্লিপ, রাংতার প্যাকেট মাথা ধরার বড়ি, কয়েকটা ট্র্যাংকুলাইজার ট্যাবলেট এবং তারপরই বেরিয়ে আসে কন্ট্রাসেপটিভ ট্যাবলেটের একটা প্রায় খালি প্যাকেট। একুশটা ট্যাবলেট থাকে। তার মধ্যে মোটে দুটো অবশিষ্ট আছে। মনোরম সভয়ে নেমে আসে। দিশি গাড়িটায় বসে ক্রমান্বয়ে সিগারেট খায়।

গত শীতে পাঁচটা টেস্ট খেলাই দেখল বীরু। বাইরের টেস্ট খেলা দেখতে প্লেনে যাতায়াত করল কানপুর, মাদ্রাজ, দিল্লি, আর বম্বে। এলাহি টাকার কারবার। ক'জন ভারতীয় পাঁচটা টেস্ট খেলা দেখার ঝুঁকি নিতে পারে মনোরমের হিসেবে আসে না। শেষ টেস্ট খেলা দেখে ফেরার সময়ে একটা সিন্ধি টিন-এজারকে পেয়ে গেল বীরু। ভাবী সুন্দর, উগ্র এবং ছটফটে মেয়েটি। এক ঝলকে মেমসাহেব বলে ভুল হয়। পিঙ্গল চুল মিনি স্কার্ট আর খয়েরী চোখের তারা। দমদমে বীরুকে আনতে গিয়েছিল মনোরম। মেয়েটির কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিল বীরু। মেয়েটির সঙ্গে তার বাবা ছিল। অ্যারিস্টোক্র্যাট চেহারা। বোঝা গেল

মেয়েটির দানাপানির অভাব নেই। তিন-চার দিন পরেই বীরু তার অ্যাপার্টমেণ্টে এনে তুলল তাকে। মেয়েটি খুব হাসছিল, মুখচোখ ঝলমল করছে খুশীতে। মনোরম বুঝতে পারে, এই মেয়েটিও জানে বীরু তাকে কোথায় নিয়ে যাবে এবং সেখানে কী হবে। জেনেও বিন্দুমাত্র ভয় নেই। মনোরম হাই তোলে। তার বিস্ময়বোধ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

কিছুদিনেই মনোরম বুঝতে পারে, বীরু তার আটশো টাকার অ্যাপার্টমেণ্টের চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করে। এবং কোনো মেয়েই বেশ্যা নয়। বাছাই, চমৎকার মেয়ে সব। কেউই রোগা বা মোটা নয়, গরীবঘরের নয়, হাঘরে নয়, বীরুর চেয়েও ঢের বড়-লোকের বাড়ির মেয়েও আছে তার মধ্যে। এবং কারো সঙ্গেই বীরুর প্রেম নেই। এক একদিন এক দঙ্গল পুরুষ আর মেয়ে বন্ধু নিয়েও ও ঢুকে যায় অ্যাপার্টমেণ্টে। ক্রমশ সাহসী মনোরম দিশি গাড়ি ছেড়ে ঢুকে পড়ে বাড়িটায়। লিফ্‌টে উঠে আসে ওপরে। মোজেইক মেঝের ওপরে নিঃশব্দে হেঁটে এসে বীরুর চমৎকার অ্যাপার্টমেণ্টের ফ্লাশডোরে কান রেখে শোনে ভিতরে ঝিঁক-ঝাঁই ঝিঁক-ঝাঁই ইও ইও ইও ইও টিরিকিটি টিরিকিটি টিরিকিটি ঝাঁই এরকম সব অদ্ভুত শব্দে স্টিরিও বাজছে। ঝনাৎ করে পড়ে ভেঙে গেল মদের গেলাশ। উদ্দণ্ড নাচের শব্দ। হো-হো চিৎকার। কণ্টকিত হয়েছে মনোরম। হঠাৎ দরজা খুলে ঢুকে যেতে ইচ্ছে হয়েছে উদ্দাম আনন্দিত ঘরখানার মধ্যে। পাপ হবে না, কেউ দোষ দেখবে না। ঢুকবে?

তক্ষুনি নড়ন্ত জিভটাকে টের পেয়েছে সে। মনে পড়ে সেই দুর্ঘটনা। মনে পড়ে বয়স, সীতা। ইডিও-মোটর অ্যাকশন হতে থাকে। নিঃশব্দে নেমে এসেছে মনোরম। দিশি গাড়িটায় বসে সিগারেট টেনেছে!

ছেলেটার কোনো ক্লান্তি নেই। সারা শীতকাল একনাগাড়ে টেনিস খেলল একটা ক্লাবে। একটু দূর থেকে, পার্কের রেলিং

ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মনোরম দেখে গেল টেনিস বলের এ কোর্ট থেকে ও কোর্ট যাতায়াত, আর পফ পফ শব্দ শুনল। ফার্স্ট ডিভিশন লীগে খেলে গেল ক্রিকেট। গ্রীষ্মে একটা দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাবে খোলা মাঠে জলে কাদায় ভূত হয়ে ফুটবল লাথিয়ে গেল। কোনো খেলাই খুব মন্দ খেলে না। কিন্তু কেমন একটু নিরাসক্ত উদাসীন ভাব। যেন কোনো কিছুতেই গা নেই।

ও কি নিরাসক্ত, সন্ন্যাসী? না কি পাষণ্ড?

ইউ এস আই এস-এর সামনে ছাত্রদের একটা র‍্যালি ছিল, ভিয়েৎনামের যুদ্ধের প্রতিবাদে। সেদিন একটা হ্যাণ্ডলুমের পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরে ট্রলের ওপর দাঁড়িয়ে মাইক্রোফোনের মাউথ-পীস মুখের কাছে টেনে বীরু বক্তৃতা করল। প্রথমে ধীরে ধীরে ভিয়েৎনামের যুদ্ধের কারণ ব্যাখ্যা করল, মার্কিন ভূমিকার পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিল, সিয়াটোর ভূমিকা ব্যাখ্যা করল, প্রসঙ্গত ইওরোপ এবং এশিয়ায় মার্কিন দু'মুখো নীতির চমৎকার সমালোচনা করল, সমাজতন্ত্র কী এবং সমগ্র এশিয়ার অর্থনৈতিক মুক্তি কী ভাবে আসবে তা বলে গেল বিশুদ্ধ বাংলায়। বলতে বলতে থেমে গেল না, কিন্তু ভাবতে ভাবতে বলল, থেমে থেমে। ঝোড়ো আবেগ নেই, কিন্তু নিবেদনটি ভারী আন্তরিক। ও যে এত ভাল বাংলা জানে কে জানত তা? কিংবা রাজনীতির এত খবর রাখে, জানে ভূগোল ইতিহাস? দাঁড়াল ঠিক তরুণ এক বিদ্রোহীর মতো। এত সুন্দর ভঙ্গীটি!

সব রকমের জুয়া খেলে বীরু। সাট্টা থেকে ঘোড়দৌড়। ঘোড়দৌড়ের মাঠে একদিন মুখোমুখি পড়ে গেল মনোরম। অবিরল হারছিল বীরু। মুখে একটু বিরক্তির চিহ্ন দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু হতাশা বা ভেঙে-পড়া ভাব ছিল না। রেজাল্ট ওঠা মাত্র হাতের টিকিট দুমড়ে ফেলে দিচ্ছিল। আবার লম্বা পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল কাউন্টারের দিকে। বীরু কিছুই দেখে না—এই বিশ্বাসে মনোরম সেদিন তেমন আড়াল হয়নি।

খোলাখুলি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ঘোড়াদের স্টার্টিং পয়েন্টে হাঁটিয়ে নেওয়া হচ্ছে পঞ্চম রেস্-এর আগে। রেলিং ধরে বীরু দাঁড়িয়ে ঘোড়া দেখল, তারপর হঠাৎ কাউন্টারে যাবে বলে ঘুরে দাঁড়াতেই মুখোমুখি।

একটু অবাক হল বীরু, সামান্য কৌতূহল দেখা গেল চোখে। ঘাবড়ে গেল না একটুও। বরং মনোরম ঘাবড়ে যাচ্ছিল।

বীরু একটু এগিয়ে এসে বলে—তুমি খেল?

—খেলি।

—দেখিনে তো কখনো।

—গ্র্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডে আসি না তো!

—আমি তো তুই স্ট্যাণ্ডেই খেলি। বলে মিষ্টি করে হাসল। বলল—কী খেলছো এটায়?

—ঠিক করিনি।

—আমি 'ডাকু'র ওপর অনেক টাকা খেলছি, কিন্তু হবে না, দিনটা খারাপ। কুড়িটা জ্যাকপট মিলিয়ে রেখেছিলাম। সবকটা গেছে ফিফ্থ রেস-এর মধ্যে।

—কত হেরেছিস?

—হাজারের ওপর তো বটেই। এখনো হিসেব করিনি। তুমি?

—গোটা পঞ্চাশ।

—মোটে? তুমি তো লাকি। আবার হাসল বীরু।

—আর খেলিস না।

—কেন? বীরু ভ্রূ তোলে।

—খামোকা খেলবি। এক একটা দিন অনেকে কেবল হারে।

—আমি রোজ হারি! হারজিৎ তো আছেই। তবে এ রেসটার পর কেটে পড়ব। ভাল লাগছে না।

—আমিও।

—কোথায় যাবে ?

—ঠিক নেই। মামার কাছে যেতে পারি।

—ঠিক আছে। একসঙ্গে ফিরব। আমার গাড়ি নেই, গ্যারেজে দিয়েছি, ট্যাক্সিতে ফেরা যাবে।

সেটা জানত মনোরম। তাই একটু বিপদে পড়ল। তারও গাড়ি আছে। মামার দিশি গাড়িটা। বলল—আমার গাড়ি আছে।

অবাক হয়ে বীরু বলে—নিজের গাড়ি ?

—না না, মামার গাড়িটাই। কয়েক ঘণ্টার জন্য চেয়ে এনেছি।

—বাবা দিল ? কাউকে তো দেয় না।

—আমি তো বিজনেস্ টুর-এ আছি।

—তাই বলো। নইলে দিত না।

রেস-এর পর তারা গাড়িতে এসে উঠল। বীরু গাড়িতে বসে চারদিকে চেয়ে গাড়িটা একটু দেখে বলে—রদ্দি জিনিস।

—কী ?

—এটা। গাড়িটা।

—দিশি মাল, আর কত ভাল হবে।

—তুমি তো ভালই চালাও।

—অভ্যেস।

—অভ্যেস কেন ? বাবা তোমাকে দিয়েই সফারের কাজ করায় নাকি ?

—না, তা নয়। স্ট্রোকের পর নিজে চালাতে ভরসা পায় না, আমিই চালাই।

—অঃ !

একটু চুপ।

—বাবা তোমাকে কত দেয় ?

—দেয় কিছু। আমার চলে যায়।

—তোমার একটা বিজনেস ছিল না ?

—ছিল। বেহাত হয়ে গেছে।

—শুনেছি, খুব রোজগার করতে ?

—হতো মন্দ না।

—তাহলে এখন চলে যাচ্ছে কী করে ? বাবা বেশি দেওয়ার লোক নয়।

—একা মানুষ তো, চলে যায়।

—একা তো আমিও।

—তুই একা কেন ? মামা মামী কী হিসেবের মধ্যে নয় ?

—হলেও তারা ডিপেণ্ডেন্ট তো নয়। বরং আমিই ডিপেণ্ডেন্ট। একা আমারই তো কত খরচ ! গাড়িটা বাঁয়ে ঘুরিয়ে নাও, সামনের রাস্তায়।

—কেন ?

—আমার একটা অ্যাপার্টমেণ্ট আছে রিচি রোডে, যাবো।

একটু চমকে গিয়েছিল মনোরম। ওর যে একটা অ্যাপার্টমেণ্ট আছে সেটা জানতে মনোরমকে কত কষ্ট করতে হয়েছে, আর সেই অত্যন্ত কষ্টসাধ্য খবরটা ও কত সহজেই দিয়ে দিচ্ছে নিজে। বিন্দুমাত্র গোপন করবার চেষ্টা নেই। একটু হতাশ হয় মনোরম।

মনোরম গাড়ি ঘোরাল।

—যাবে আমার অ্যাপার্টমেণ্টে ?

—সেখানে তুই কী করিস ?

—অনেক কিছু। তবে বেশীরভাগ সময়ে বসে রেস্ট নিই, আর বই পড়ি। তুমি ড্রিঙ্ক করো ?

—কী বলছিস ?

—ড্রিঙ্ক করো তো ?

একটু ভাবল মনোরম। বলল—করি।

—আমার ফ্ল্যাটে একটা ছোট্ট বার আছে। যাবে ? রেস্-এর

পর তোমার টায়ার্ড লাগছে না ?

—লাগছে।

—তাহলে চলো। ওল্ড স্মাগলার হুইস্কি খাওয়াবো।

একটু চুপ।

—মামা জানে ?

—কী ?

—তোর যে একটা ফ্ল্যাট আছে।

—জানলে জানে। আমি তো লুকোইনি, আবার আগ বাড়িয়ে কিছু বলিওনি।

—বলিসনি কেন ?

—ওটা আমার একার জায়গা। আমার মেয়ে-বন্ধুরা আসে। ছেলে-বন্ধুরা আসে। গেট-টুগেদার হয়। নাচ-গানও হয়। বাবা মা জানলে ওখানে হানা দিতে থাকবে। ফ্ল্যাট নেওয়ার উদ্দেশ্যটাই নষ্ট হবে তাহলে।

—আমাকে তবে নিচ্ছিস কেন ?

বীরু হাসে, বলে—এমনিই। রেস্-এর মাঠে তোমাকে দেখে খুব মায়া হল। ভারি ছন্নছাড়া দেখাচ্ছিল তোমাকে। ভাবলাম হঠাৎ বিপাকে পড়ে বাবার চাকরি করছো, নিশ্চয় তুমি খুব সুখে নেই। তাই ভাবলাম, তোমার সঙ্গে একটু ড্রিঙ্ক করি।

মনোরম একটু হেসে বলল—তুই আমার ছোটো ভাই, তা জানিস ?

—সম্পর্কটা এখন খুঁচিয়ে তুলবে নাকি ?

—না, না, এমনি বললাম।

—আত্মীয়তা ব্যাপারটা আমি দুচোখে দেখতে পারি না। ওটার মধ্যে অনেক ভণ্ডামি আছে।

—কীরকম ?

—আত্মীয় বলেই অনেকে অনেকের কাছ থেকে কিছু সম্মান বা সুবিধে পায়, যেটা তাদের পাওনা নয়। সম্মান বা সুবিধে

পাওয়ার জন্য মিনিমাম কিছু যোগ্যতা থাকা দরকার। কেবল আত্মীয়তা কখনো সেই যোগ্যতা হতে পারে না। সেইজন্য আমি গুরুজনটন মানি না।

মনোরম বুঝেছে, মাথা নাড়ল।

বীরু কী সুন্দর নরম ব্যবহার করছিল সেদিন! ভাবা যায় না। বীরু যে এত নরম এবং বিষণ্ণ স্বরে কথা বলতে পারে, তা কে জানত?

গোপনে গোয়েন্দার মতো দিনের পর দিন যে ফ্ল্যাটটার ওপর নজর রাখত মনোরম সেই ফ্ল্যাটে সেদিন সে অনায়াসে ঢুকল।

ফ্ল্যাটটা ভালই। এ সব ফ্ল্যাট যেমন হয়, তেমনি। তিনখানা ঘর, ডাইনিং স্পেস-কাম-বৈঠকখানা, সবই আছে, কিন্তু আসবাবপত্র বেশি কিছু নেই। একটা বেশ বড় খাট, তাতে ফোম রবারের গদী, গদীর ওপর মণিপুরী চাদরে ঢাকা বিছানা কুঁচকে আছে। চেয়ার টেবিলগুলো দামী কিন্তু যেখানে সেখানে ছড়ানো, মেঝে ভর্তি সিগারেটের শেষ টুকরো সব পড়ে আছে, টেবিলের ওপর চারখানা অ্যাশ-ট্রে উপচে পড়ছে ছাই, দেশলাইয়ের কাঠি আর সিগারেটের টুকরোয়। মেঝের ওপর পড়ে আছে ষ্টিরিওটা। রেকর্ডের গাদা ছুটো স্পিকারের ওপর রাখা। মেয়েলী হাতের স্পর্শ নেই। অজস্র বই চোখে পড়ে। সবই ইংরিজি। দর্শন, রাজনীতি থেকে ডিটেকটিভ বই পর্যন্ত। বৈঠকখানা ঘরের দেয়ালে বিল্ট-ইন ক্যাবিনেট খুলে গেলাশ বের করে বীরু, আর হুইস্কির বোতল। বলে—ডাইলিউট্ করতে হলে ট্যাপ থেকে জল মিশিয়ে নাও। আমি নীট খাই, সোডা-ফোডার ঝামেলা নেই।

সন্ধ্যে নাগাদ অনেকটাই মাতাল হয়ে গিয়েছিল মনোরম। কথা একটু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। পেটে পুরোনো গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা, খালিপেটে অ্যালকোহল পড়তে চিন্ চিন্ করে উঠছিল মাঝে মাঝে। ব্যথাটা কমাতেই বেশি খেল মনোরম।

—তোর মেয়ে-বন্ধুরা এখানে আসে ?

—আসবে না কেন ?

—একা ?

—একাও।

আবার কিছুক্ষণ মদ খেল দু'জন।

—বীরু।

—উঁ।

—মেয়ে-বন্ধুদের মধ্যে কাকে তোর ভাল লাগে সবচেয়ে ?

—সবাইকে। অদ্ভুত মদির হাসি হাসে বীরু, বলে—কে ভাল নয় বলো! মেয়েরা সবাই এত ভাল, এত সিম্প্যাথেটিক। আই লাভ দেম।

—কাউকে বেশি ভাল লাগে না ?

—কাউকে অন্য কারো চেয়ে বেশি ভাল লাগতে পারে। তবে সকলেরই আলাদা রকমের ইন্টারেষ্টিং পয়েন্ট আছে।

—ধর, কারো সঙ্গে প্রেম করিস না ?

—প্রেমই তো। শুধু আণ্ডারওয়্যার পরে বসে ছিল বীরু বেতের গোল চেয়ারে। লম্বা পা দু'খানা সামনে ছড়ানো। এমনভাবে 'প্রেমই তো' বলল, যেন ভিয়েৎনামে মার্কিন নীতির নিন্দে করছে।

—তোর গার্ল ফ্রেণ্ডদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কে ?

—কে সুন্দর নয়। হাসল বীরু—সবাই নিজের নিজের মতো করে সুন্দর। আমি একদম হারিয়ে যাই ওদের মধ্যে। আজকাল আমার এমন হয়েছে যে রাতে শুয়ে যদি কারো কথা ভাবি তাহলে ওর চোখ ওর মুখে এসে বসে, এবং ঠোঁট তার মুখে চলে যায়। বিশেষ কাউকে মনে পড়ে না। সে এক ভারি ঝামেলা। শোওয়ার সময়ে বিশেষ একজনকে ভাবতে ইচ্ছে করে, পারি না।

—কাকে ?

—রোজ তো একজনকে নয়।

—তোর বন্ধুদের মধ্যে একজন আছে না, গৌরী! মাতাল মনোরম বলে ফেলল।

একটু স্থির হয়ে যায় বীরু, তারপর বলে, জানলে কী করে?

মনোরম মনে মনে ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু ফেরার উপায় নেই।

খুব চালাক হওয়ার চেষ্টা করে বলল—গৌরী তো কমন নাম! আন্দাজে টোপ্ ফেললাম একটা।

—আন্দাজে! বলে একটু হাসে বীরু, তারপর বিষণ্ণ মুখে বলে—আন্দাজে হলেও লাগিয়েছো ঠিক। গৌরী একজন আছে।

—সে আসে?

—আসবে কি, সে এখন নার্সিং হোমে!

—কেন?

—বড্ড বোকা মেয়ে। আজকাল কেউ যে অত বোকা আছে তা জানতাম না।

মনোরম ধৈর্যভরে পান করল আর একটুক্ষণ।

—কী হয়েছে?

—অ্যাকলেম্শিয়া। তার ওপর ডানদিকটা পড়ে গেছে।

—সে সব তো বাচ্চা-টাচ্চা হলে হয়।

—তাই তো হয়েছে। প্রি-ম্যাচিওর বাচ্চা একটা।

—কী করে হল?

—যেমন করে হয়। আজকাল যে এমন বোকা মেয়ে আছে, কে জানত! প্রেগন্যান্সিটা কেবলই অস্বীকার করে যেত। অথচ আমরা জানতাম। আমার মতো ওর অনেক বিশ্বস্ত এবং সৎ বন্ধু ছিল। ও স্বীকার করলে আমরা খুব সেফ্লি ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতাম, কেউ জানত না। ও লজ্জায় কোনদিন স্বীকার করেনি।

—বাঁচবে?

—চান্স কম। প্রচুর হেমারেজ হয়েছে। 'কোমা'-য় পড়ে আছে। কথা-টথা বলতে পারে না, জ্ঞানও ঠিক নেই। কাল

থেকেই মনটা তাই খারাপ! মাঠ থেকেও সেজন্যই তাড়াতাড়ি চলে এলাম।

—তুই ওকে ভালবাসিস না বীরু?

—বাসি। বিশেষ করে আজ তো ওকেই ভালবাসছি। কষ্ট হচ্ছে। কষ্ট হওয়া তো ভালবাসাই, না?

—ও যদি বাঁচে?

—খুব ভাল হয় তাহলে। আমি একটা পার্টি দেবো।

—বিয়ে করবি ওকে বীরু?

—বিয়ে? বীরু তাকায়। একটু ভাবে। বলে—ওকেই কেন করব?

—বড় ভাল দেখতে মেয়েটা।

—কোথায় দেখলে? একটুও বিস্মিত না হয়ে সাধারণ প্রশ্ন করে বীরু।

—দেখেছি।

—হ্যাঁ, ভালই। বিয়ে ওকেও করতে পারি। কোনো প্রেজুডিস নেই।

—কে ওকে প্রেগন্যান্ট করল?

—কে জানে। যেই হোক, গৌরীর সাবধান হওয়া উচিত ছিল। ওরই দোষ। মুঠো মুঠো ট্যাবলেট বাজারে বিক্রি হয়। কত মেয়ে নিজেরাই গিয়ে কেনে। ওরই কেবল লজ্জা আর লজ্জা।

—তুই ওকে বিয়ে করিস বীরু।

—আগে বাঁচুক তো! তুমি কি আরো খাবে? খেও না। গাড়ি নিয়ে যাবে তো, না খাওয়াই ভাল। আমি আজ বাড়ি ফিরছি না। আর একটু খেয়ে পড়ে থাকব।

—বাড়িতে খবর দেবো?

—না না, কোনো দরকার নেই। মাঝে মাঝে আমি ফিরি না, সবাই জানে। তুমি যাও।

শূন্য গেলাস রেখে মনোরম উঠে এসেছিল।

সেই একটা সুদিন এসেছিল। তার পরদিন থেকেই বীরু আবার আলাদা মানুষ। গ্রাহ্য করে না, তাকায় না। কথা তো নেই-ই, আবার একজন অচেনা মানুষ হয়ে যায় বীরু।

খুঁজে খুজে নার্সিং হোমটা বের করেছিল মনোরম। মেয়েটা বেঁচে গেছে। বীরু আবার গাড়ি দাবড়াচ্ছে। মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছে অ্যাপার্টমেন্টে। ওর ঘরে উদ্দাম বেজে যাচ্ছে স্টিরিওতে নাচের বাজনা। মনোরমের কথা কি মনে রেখেছে বীরু? না ভুলে গেছে?

ও কি উদাসীন সন্ন্যাসী? ও কি পাষণ্ড? ওকে ঠিক বুঝতে পারে না মনোরম। একেই কি জেনারেশন গ্যাপ বলে? বীরুর পিছু নিতে নিতেই মনোরম তার পোশাক পালটে ফেলল। রাখল বড় চুল, জুলফি। দিশি গাড়িটা নিয়ে সে যেমন বীরুর ফিয়াটের সঙ্গে তার দূরত্বটা কমিয়ে আনার চেষ্টা করেছে, তেমনি জেনারেশন গ্যাপটাও অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে।

সেই মায়াদয়াহীন মুখখানা! বীরু বসে আছে টেবিলের উল্টো-দিকে। ফাইলপত্র ঘাটছে। মনোরম অস্বস্তির সঙ্গে চেয়ে ছিল।

ফাইলটা বন্ধ করে বীরু মুখ তুলল। হঠাৎ আতঙ্কিত আনন্দে মনোরম দেখে ও হাসছে।

—তোমার বউকে কাল দেখলাম।

—কে! কার কথা বলছিস?

—তোমার বউ সীতা।

সীতা! বউ! বউদি নয়? একটু অবাক হয় মনোরম।

—কোথায়?

—নিউ মার্কেটে। শী হ্যাড কোম্পানি।

—ওঃ! তোকে চিনল?

—এক আধবারের দেখা, ঠিক চিনতে পারেনি। আমি

চিনেছি। মেয়েদের মুখ আমার মনে থাকে।

—কথা-টথা বললি ?

—হুঁ। সেইটেই একটা ভুল হয়ে গেল।

—ভুল ?

—চিনতে পেরেই হঠাৎ ‘বউদি’ বলে ডেকে ফেলেছিলাম। খুব ঘাবড়ে গেল। তাই এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দিলাম। একটু কষ্টে চিনল। দু-চারটে কথাবার্তা হল।

—বউদি বলে ডাকলি ?

—তবে কী বলে ? বউদিই তো হয়! ছাই সেটাও একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল।

—কেন ?

সঙ্গে যে লোকটা ছিল, ওয়েলবিল্ড কেভম্যান, সে লোকটা আমার দিকে ভীষণভাবে চেয়ে রইল। আমি বউদির সঙ্গে কথা বলছি, আর লোকটা অপলক চেয়ে আছে, যেন খেয়ে ফেলবে। যখন চলে আসছি তখন লোকটা আমাকে ডাকল, একটু আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল—আপনি ওকে বউদি ডাকলেন, কিন্তু ও এখন কারো বউ নয়, জানেন ? আমিও ভেবে দেখলাম কথাটা ঠিক। ক্ষমা-টমা চেয়ে নিলাম। ও নিজেই বলল—বরং ওকে নাম ধরে ডাকতে পারেন, কিংবা মিস্ সান্যাল বলে। আমি সেটাও মেনে নিলাম। চলে আসবার সময়ে তোমার এক্স-বউকে ডেকে বললাম—সীতা, চলি।

মনোরম কিছু শুনছিল না। শুধু বলল—হুঁ।

—লোকটা রুস্তম টাইপের, আর খুব জেলাস্। গায়ে অনেক মাংস, সাতটা বাঘে খেয়ে শেষ করতে পারে না।

কৌতুকভরে সীতা চেয়ে আছে মনোরমের মুখের দিকে। মনোরম মুখটা ফিরিয়ে নেয়। জিভটা সব সময়েই নড়ে, কিন্তু অভ্যাস বলে সব সময়ে মনোরম তা টের পায় না। এখন পেল। মুখের ভিতরে যেন একটা হৃৎপিণ্ড, অবিরল তার মৃদু শব্দ।

॥ চার ॥

দিন যায়। মাঝে মাঝে খুব মেঘ করে আসে। বৃষ্টি হয়। কখনো রোদ উঠে নীল জলের মতো আকাশ দেখা যায়। ঘরে ভাল লাগে না। স্পষ্টই বোঝে, বাড়িতে কুমারী-জীবনে যেমন ছিল সে, তেমনটি আর নেই। বিবাহিতা অবস্থায় যেমন ছিল, তেমনটাও নেই। দাদাই যা একটু সহজ। কিন্তু সীতার সঙ্গে দাদার দেখা হয় কতটুকু সময়! মক্কেল আর কোর্ট কাছারী নিয়ে দাদা বড় ব্যস্ত।

মনোরম জামাই হিসেবে এ বাড়ির কারো পছন্দের ছিল না। তবু সবাই এক রকম তাকেই ছোট জামাই হিসেবে মেনে নিয়েছিল। সীতা ভুল করেছে, এ কথা সবাই বুঝত। সীতাও বুঝেছে, একটু দেরিতে।

বাবা ইদানীং কানে বড় কম শোনে। একটা যন্ত্র আছে কানে পরবার। তাতেও খুব একটা কাজ হয় না। একটু চেঁচিয়ে বললে শোনে।

"মেয়ে, কখনো পরপুরুষের সঙ্গে একা রাস্তায় হেঁটো না।"

"মেয়ে, বাবা আর ভাই ছাড়া কোনো পুরুষের উপহার নও না।"

বিয়ের আগে এসব কথা একটা ক্ষুদে বই থেকে বাবা তাকে মাঝে মাঝে পড়ে শোনাত। বইটার নাম ছিল, নারীর নীতি। উপদেশ দুটো সীতা মানেনি। শিমুলতলার প্রকৃতিতে কী একটা ছিল, মাদকতাময়, বাধা ছিন্ন করার নিমন্ত্রণ।

বিয়েটা পছন্দের না হোক, বাবা তবু বিয়ের পর সেই বইটা থেকেই আবার শোনাত—স্ত্রী হচ্ছে পুরুষের বিশ্রামের জায়গা।

যখন খেটেখুটে সে ফিরে আসবে, তখনই তাকে অভাব-অভিযোগের কথা বোলো না। তাকে সেবা দিও, সুস্থ করে তুলো, তারপর মৃদু নম্র ভাষে যা বলার বলো। মনে রেখো, তুমি তাকে তোমার দিকে আকৃষ্ট করে রাখার চেষ্টা করলে সে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসবে। সার্থক হবে না-সে। বরং তাকে আদর্শের দিকে ঠেলে দিও, সে পৃথিবী জয় করবে···ইত্যাদি। বয়সে অনেক বড় ছিল মনোরম, সীতার চেয়ে প্রায় দশ বছরের বড়। বাবাকে এ ব্যাপারটা খুব খুশী করেছিল, স্বামীর সঙ্গে বয়সের বেশী তফাৎ থাকাই নাকি ভাল, এগুলো মনে রাখার কথা নয়। সীতা রাখেনি। উপদেশ হচ্ছে পেটেন্ট অষুধের মতো। রোগ কী তা না জেনেই কিনে এনে খাও। সকলেরই তো একই রোগ নয়। বিশেষ অসুখের জন্য বিশেষ অষুধ দরকার। তার জীবনে উপদেশটা ঠিক খাটেনি। তবু বিয়ের পর বহুকাল বাবা তাকে নারীর নীতি পড়ে শুনিয়েছে। মনোরমকে কোনো আদর্শের দিকেই ঠেলে দিতে পারেনি সীতা। তারা প্রেম করেছে, রতি-ক্রিয়া করেছে, খেয়েছে, ঘুরেছে। ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে, আবার ভাবও। সন্দেহ এবং অবিশ্বাস এসেছে, আবার প্রেমও করেছে এবং তারপর ক্লান্তি এসেছিল। এল নিস্পৃহতা। যত বয়স বাড়ছিল, ততই মনোরম পুরোপুরি বাধ্য পরিচারিকা তৈরী করতে চেয়েছিল সীতাকে। প্রেমের কথা, ভালবাসার স্পর্শ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। অনেক সময়ে শরীর ঘটিত না এক নাগাড়ে সপ্তাহ-ভর। কেবল বুকের মাঝখানে কামগন্ধহীন মাথাটা এগিয়ে দিত। সীতা মাঝে মাঝে সে মাথাটা সন্তর্পণে বালিশে তুলে দিয়ে পাশ ফিরে শুয়েছে। মানস এসে বসত বাইরের ঘরে। একটু দূরত্ব বজায় রেখে বসত, কিন্তু তার হাসি, আন্তরিকতাময় কথাবার্তা শরীরের দূরত্বটুকু অতিক্রম করত অনায়াসে। কিন্তু এগুলো কারণ নয়। আসল কারণ ঐ সন্দেহ। মাঝেমধ্যে একটা অস্পষ্ট যৌনঋণ-এর কথা উল্লেখ করতে থাকে মনোরম। কচিৎ কদাচিৎ

যখন তারা শরীরে শরীর মেলাত, তখন মনোরমের ছিল শ্বাসকষ্টের মতো দম ফেলতে ফেলতে ঐ প্রশ্ন -বলো তো, আমি কে?

—তুমি! তুমি তো তুমিই! আবার কে?

—না, না, ঠিক করে বলো। ঠিক করে বলো। আমি কে?

—তাহলে জানি না।

—তাহলে আমি বলি?

—বলো।

—রাগ করবে না?

—কী এমন বলবে যে রাগ করব?

—আমি এখন আমি বোধ হয়—মানস লাহিড়ী!

—কী বলছো?

—নই?

-তুমি অন্য লোক হতে যাবে কেন?

-আমি অন্য লোক নই। কিন্তু তুমি যাকে ভাবো?

—ভাবো? ভাববো আবার কী? কেন ভাববো?

—আমি তো পুরোনো হয়ে গেছি। আমি তো আর উত্তেজক নই। এই বয়সেই স্বামী-স্ত্রী অন্য মানুষকে ভাবতে শুরু করে।

স্তব্ধ হয়ে থেকেছে সীতা। বুকের ওপর মানুষ, কত কাছের মানুষ, তবু কি অস্বস্তিকর জটিলতা!

কোনোদিন বা সুখকর বনিষ্ঠতার মুহূর্তে -

—মানুষের মন, তার কোনো ছবি দেখা যায় না।

—কী বলছ?

—মানুষ মনে যে কে কাকে ভাবে!

সীতা ঝাঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করেছে—স্পষ্ট করে বলো।

—আমি এখন তোমার মনের ভিতরটা দেখতে চাই।

—কেন?

—দেখতে চাই, সেখানে কে আছে!

—তুমি কি পাগল?

—কেন ?

—তুমি আমাকে সন্দেহ করো ?

মনোরম চুপ।

সীতা দু' হাতে মনোরমের বাহু খামচে ধরে বলেছে—বলো, সন্দেহ করার মতো তুমি কী দেখেছো! কী করেছি আমি ?

—কিছু দেখিনি। শুধু দেখেছি, তোমরা বাইরের ঘরে টেবিলের দু'পাশে দু'জন বসে আছো। তুমি উল বুনছো, মানস তোমার দিকে চেয়ে আছে। আর কিছু না।

—তবে ?

—কিন্তু আমার মনে হয়েছে, তোমাদের দু'জনের মাঝখানে একটা অদৃশ্য সাঁকল। বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো কী একটা যাতায়াত করছে! একটা বলয়, সেটা শূন্য, অদৃশ্য, কিন্তু আছে। তোমরা ভালবাসার কথা বলো না। কিন্তু ও তোমাকে কমপ্লিমেণ্ট দেয়, যা আমি আগে দিতাম তোমাকে, এখন আর দিতে পারি না। আমার স্টক ফুরিয়েছে। তোমাকে পেয়েছি যখন, তখনই হারিয়েছি। রহস্য শেষ হয়ে গেছে আমাদের। কিন্তু ও নতুন, বাইরে থেকে এসেছে। ওর দেওয়ার আছে অনেক। তুমিও নিচ্ছ। জমে উঠছে ঋণ। সে ঋণ কী ভাবে শোধ হবে ?

সীতা কেঁদেছে, না বুঝে।

মনোরম তবু বলেছে—সেই ঋণ শোধ হয় কল্পনায়। আমার শরীরে চলে আসে মানস লাহিড়ী।

কাঁদতে কাঁদতেও সীতা রেগে গিয়ে বলেছে—কল্পনা। সে তো তোমারই! তুমি মেয়েদের নিয়ে কল্পনা করতে না ?

—এখনো করি। কবি বলেই ধরতে পারি।

—না, আমি তোমার মতো স্বপ্ন দেখি না। আমার অত কল্পনাশক্তি নেই। কারও ধার আমি ধারি না।

এইভাবে মাঝরাতে উঠে তাদের ঝগড়া হত। প্রচণ্ড ঝগড়া।

মনোরম ভুল করেছিল। তার নিজের কল্পনাশক্তিই থেকে ফেলেছে তাকে। নিজের দোষ সে সীতার ওপর আরোপ করতে শুরু করেছিল।

কিন্তু মানস আসত। উল বুনত সীতা। মানস বসে থাকত। না, দূরত্বটা কখনো অতিক্রম করত না মানস। তার আছে নিজেকে ধরে রাখার অমানুষিক ক্ষমতা। কিন্তু থেমে-থাকা স্টার্ট-দেওয়া মোটরগাড়ি যেমন কাঁপে, তেমনই কি কেঁপেছে মানস! বিবাহ-বিচ্ছেদের পরও সে সীতার শরীর আক্রমণ করেনি বহুদিন। অপেক্ষা করেছে। মাত্র সেদিন সে…

কিন্তু ঘুরেফিরে সেই মানসই এল। মনোরম ভুল বলেছিল বটে, তবু ভুলটাকে সত্যি করে দিল নাকি সীতা? এখন যদি মনোরম কখনো সামনে এসে দাঁড়ায়, যদি প্রশ্ন করে, তবে মূক হয়ে মাথা নত করে নেবে না কি সে?

বাবা সেই ক্ষুদে বইটা থেকে তাকে উপদেশ শুনিয়েছে কুমারী অবস্থায়। বিবাহিতা জীবনে। কিন্তু যখন এই তৃতীয় অবস্থায় সে ফিরে এসেছে বাপের বাড়িতে, তখন আর বাবা সেই ক্ষুদে বইটা পড়ে তাকে শোনায় না। বেশির ভাগ সময়েই কানের যন্ত্রটা বাবা আজকাল খুলে রাখে।

গোপন কোনো কথা বলতে হলে দাদা বাবাকে ছাদে নিয়ে যায়। সেখানে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে। সীতা এবার এলেও দাদা ওরকমভাবে বাবাকে ছাদে নিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়েছে। বাবা সীতাকে কিছু বলেনি। কেবল তাঁর দন্তহীন মুখে বার বার ঠোঁট জোড়া গিলে ফেলেছে বাবা। চারদিকে চেয়ে কী যেন খুঁজেছে। এ সময়ে বোধহয় মৃতা স্ত্রীকেই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল মানুষটার। ছেলেমেয়েদের কথা বাবা আর বুঝতে পারে না। স্ত্রী বেঁচে থাকলে একমাত্র তার কথাই মানুষটা

বুঝতে পারত।

নীচে দাদার অফিসঘরে টেলিফোন আছে। ওপরের হলঘরে তার এক্সটেনশন। 'কল' এলে দুটো ফোনই বাজে। নিয়ম হল টেলিফোনে রিং হলে নীচে দাদা ধরে, ওপরে সীতা, বাবা কিংবা বউদি। দাদার কল হলে ছেড়ে দেয়, নিজেদের 'কল' হলে দাদা ছেড়ে দেয়।

সেদিন বউদি কালীঘাট গেছে, সীতা বাথরুমে। বাবা হল-ঘরে বসে কাগজটা খুঁটিয়ে পড়ছে। সে সময়ে টেলিফোন বাজ-ছিল। বাবা ধরল না। সীতার গায়ে তখন সাবান। সে চেঁচিয়ে বলল—বাবা, ফোনটা ধরো। শোনার কথা নয় বাবার। বেজে বেজে টেলিফোন থেমে গেল। নীচে দাদা ধরেছে। একটু পরেই দাদা সিঁড়ির গোড়ায় এসে চেঁচিয়ে বলল—সীতা, ফোনটা ধর। তোর 'কল'।

কোনোক্রমে গায়ে কাপড় জড়িয়ে বেরিয়ে এসেছিল সীতা। ফোন কানে নিল। কোনো শব্দ হল না। হ্যালো, হ্যালো, অনেকবার করল সে। কোনো উত্তর নেই। বোধ হয় ছেড়ে দিয়েছে। ফোনটা রেখে দেওয়ার আগে তার অস্পষ্টভাবে মনে হল, ওপাশে যেন একটা দীর্ঘশ্বাসের অস্ফুট আওয়াজ হল। ভ্রু কোঁচকাল সীতা। ভুলই হবে। রেখে দিল। বাবাকে বলল—ফোনটা ধরোনি কেন বাবা, দেখ তো লাইনটা কেটে গেল।

বলেই লক্ষ্য করল, বাবার কানে যন্ত্রটা নেই। বাবার ঘর থেকে যন্ত্রটা নিয়ে এল সীতা। বাবার কানে লাগাতে লাগাতে বলল—কেন যে যন্ত্রটা পরে থাকো না!

বাবা হঠাৎ মুখ তুলে আঁতকে উঠে বলে—না, না! ওটা লাগাস না।

সীতা অবাক হয়ে বলল—কেন?

বাবা সীতার ঠোঁট নড়া দেখে বলে—ওটার আর দরকার নেই।

—বাঃ। তুমি যে এটা না হলে শুনতে পাও না!

বাবা চোখটা সরিয়ে নিয়ে বলে—অনেক শুনেছি। সারা জীবন। আর কিছু শুনতে চাই না। ঠাকুর করুন, যে কটা দিন বাঁচি, আর যেন কিছু শুনতে না হয়। এটা ফেলে দে।

এইভাবেই বাবা তার পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতার জগতে চলে গেছে। স্বেচ্ছায় নির্বাসন। মাঝে মাঝে বাবার ঘরে যেতে ইচ্ছে করে সীতার। যায়। বাবা চোখ সরিয়ে নেয়। আর বার বার দন্তহীন মুখে নিজের ঠোঁটজোড়া গিলে ফেলতে থাকে। কচ্ছপের মুখের মতো। কথা বলে না। বলতে পারে না। বাঁধানো দাঁতের পাটিজোড়া বাবা ছেড়ে রেখেছে, খাওয়ার সময় ছাড়া পরে না। চশমাও খুলেই রেখে দেয় বেশির ভাগ সময়। একটি বুড়োটে, আর কুঁজো হয়ে বসে থাকে ঘরে। যেন বা নকল দাঁত, নকল চোখ, নকল কান, কিছুরই আর প্রয়োজন নেই বাবার। ঠাকুর যা করেন মঙ্গলের জন্যই এরকম বিশ্বাসে সব নির্মোক ঝেড়ে ফেলে প্রতীক্ষায় বসে আছে বাবা। কিসের? এক পরিপূর্ণতম নিস্তব্ধতার? নিশ্ছিদ্র এক অন্ধকারের? অন্তহীন ঘুমের? বাবা কিছুই শোনে না। চারধারে এক নিস্তব্ধতার ঘেরাটোপ। সীতা মাঝে মাঝে যায়। বসে থাকে। খুদে বইটা থেকে উপদেশ-গুলো বাবা আর কোনোদিনই শোনাবে না, বুঝতে পারে। বাবার নিস্তব্ধতার কাছে ক্ষণেক বসে থাকে সে। ঠিক সহ্য করতে পারে না। অসহ্য হয়ে উঠে আসে।

নতুন কেনা একটা শাড়িতে 'ফলস্' লাগাচ্ছিল সীতা। বউদি এসে একটু দাঁড়িয়ে দেখল।

—নতুন শাড়ি?

—হুঁ।

—কে দিল ?

—কে দেবে ? নিজেই কিনলাম।

—শাড়িটার অনেক দাম নিয়েছে ?

—মন্দ না।

—আশি নব্বই ?

—ওরকমই।

বউদি একটা শ্বাস ছাড়ে, বলে—ঠাকুরঝি, তোমার কত টাকা ! তুমি কত স্বাধীন !

তুমি কি গরীব ? পরাধীন ?

—তা নয়। তবে ইচ্ছেমতো কিছু কিনে আনবো, তার তো উপায় নেই ! যা করবো, সব অনুমতি নিয়ে করতে হবে। তুমি বেশ আছো।

—এরকম 'বেশ' থাকতে চাও নাকি ?

—চাই-ই তো।

—কেন ?

—মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে সব সংসারটা হাটকে মাটকে দিয়ে চলে যাই। মেয়েমানুষ হওয়া একটা অভিশাপ।

-ওরকম সবাই বলে। আবার এসব নিয়েই থাকে।

—তুমি তো থাকোনি !

সীতা দাঁতে ঠোঁট চাপে। আস্তে বলে—ওসব কথা থাক বউদি। তুমি ঠিক বুঝবে না।

বউদি চলে গেলে অনেকক্ষণ ভ্রু কুঁচকে ফলস্‌টার দিকে চেয়ে থাকে সীতা। ফুটপাতের দোকান থেকে কেনা ফলস্‌ মাপে অনেকটা ছোটো হল, শাড়িব পুরো কুঁচিটা ঢাকা পড়বে না। খুব ঠকে সীতা। দেখেশুনে কেনে, তবু ঠিক ঠকে যায়। বরাবর। মনোরম খুব রাগ করত, বলত—মেয়েদের অভ্যাসই হচ্ছে সস্তা খোঁজা। সারা কলকাতা দু' নম্বর মালে ছেয়ে গেছে, আসল-নকল চিনবার উপায়ই নেই, কেন নিজে নিজে কিনতে যাও ?

ফল্স্টায় ঠকে গেছে বলে সীতার মনটা খারাপ হয়ে গেল খুব। (এতটাই খারাপ হল যে, সে উঠে বিছানায় গিয়ে শুল) এবং একটু পরে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে সে মনে মনে প্রাণপণে তার কান্নার গূঢ় কারণটাও বোধহয় খুঁজে দেখছিল। কারণটা খুঁজে পেল একটু পরে। বউদি একটা কথা বলেছিল—তোমার কত টাকা! তুমি কত স্বাধীন! কথাটার মধ্যে কিছু নেই। তবু আছে। মনোরমের সবস্ব কেড়ে না নিলেও পারত সে। বীরু সেদিন বলছিল, মনোরম তার কৃপণ মামার কাঠগোলায় চাকরি করছে। বীরু ছেলেটা মুখ-পাতলা। হেসে বলেছিল—আমার বাবার কাছে কাজ করা মানে কিন্তু সুখে থাকা নয়। জানো তো! না জানলেও বোঝো সাতা। সুখে নেই।

মানস আবার কাল চলে যাবে দিল্লী। চার পাঁচ দিন পরে ফিরবে। ফোন করল তুপুরে।

—আজ বিকেলে ফ্রি থেকো মৌ।

—আমি তো সব সময়ে ফ্রি।

—একটু ঘুরবো।

—আচ্ছা।

—দিল্লী যাচ্ছি।

—জানি তো।

—ভাল লাগে না।

সীতা হাসল। শব্দ করে। যাতে মানস ফোনে হাসিটা শোনে।

—বেশী দিন তো নয়।

—তা নয়। তুঃখিত গলায় মানস বলে—কিন্তু সারাজীবনই এরকম মাঝে মাঝে আমাকে চলে যেতে হবে। ছেড়ে থাকতে

পারবে তো ?

সীতা শ্বাস ফেলল, এবং সেটাও শুনতে পেল মানস। আবেগের সঙ্গে বলল—মাঝে মাঝে তোমাকেও নিয়ে যাবো।

—যেও।

—আমি সেই ক্লাবটা থেকে ফোন করছি।

—কোন্ ক্লাব ?

—সেই ক্লাবটা, যেখানে সেদিন হাসিটা ফোনে শোনাল মানস।

সীতা একটু হাসল।

মানস বলল—ইচ্ছে করলে আজ আবার আমরা এখানে আসতে পারি।

সীতা উত্তর দিল না।

—রেডি থেকো। পাঁচটায়।

কথা শেষ হয়ে যায়। তবু একটু ফোন ধরে থাকে দু'জন। পরস্পরের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনে।

ফোনে শ্বাসের শব্দ শুনলে সীতার কেমন একটু অন্যমনস্কতা আসে। ক'দিন আগে একটা ফোন কল কেটে গিয়েছিল। কেটে গিয়েছিল? নাকি কেউ সত্যি ছিল ওপাশে? একটা অস্পষ্ট দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনেছিল সীতা। ভুল? তাই হবে। কিন্তু একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায় সে।

ফোন রেখে দেয়।

ছুটন্ত ট্যাক্সিতে বার বার সিগারেট ধরাতে চেষ্টা করছিল মানস। হাওয়ায় দেশলাইয়ের কাঠি নিবে যাচ্ছে বার বার। সীতা হাসছিল।

—ওভাবে নয়। হাত দুটো 'কাপ' করে নাও। সীতা বলে।

—কাপ? সেটাই তো হচ্ছে না। আঙুলের ফাঁক দিয়ে বাতাস ঢুকছে।

—থাক, খেতে হবে না।

—খাবোই! এই ড্রাইভার রোখ্ কে।

ট্যাক্সি দাঁড়ালে সিগারেটটা ধরাতে চেষ্টা করে মানস। সীতা দেশলাই কেড়ে নেয়। নিজে যত্নে ধরিয়ে দেয়। ট্যাক্সি আবার চলে।

—কেন যে ছাই লোকে খায় এটা। কী আছে সিগারেটের মধ্যে?

বোধহয় ভালবাসা। মনে মনে এই কথা বলে সীতা। মুখ টিপে হাসে। দেখে, ধোঁয়া লেগে মানসের দুই হরিণচোখ ভরা জল।

—আর খেও না।

—কেন?

—অভ্যেস নেই। কাশবে।

—আমার মুখে কি কোনো দুর্গন্ধ আছে সীতা?

—সীতা নয়, মৌ। তুমিই নাম দিয়েছিলে।

—সিগারেটের ধোঁয়ায় মাথা আবছা হয়ে গেছে। কিছু ভাবতে পারছি না। গন্ধ নেই তো?

—না তো! তোমার মুখের গন্ধ সুন্দর।

—তবে কেন সিগারেট খেতে বললে আমাকে?

—পুরুষেরা সিগারেট খায়, দেখতে আমার ভাল লাগে।

—শুধু দেখার জন্য একজনের না-খাওয়ার অভ্যাস নষ্ট করছো?

—খেও না।

—রাগ করে বলছো?

—না, আমার অত সহজে রাগ হয় না।

—সিগারেট তো আমি খাচ্ছিই। অভ্যাস করে নেবো।

—না। মাঝে মাঝে খেও। পুরুষের মুখ কাছাকাছি এলে

একটুখানি সিগারেটের গন্ধ পাওয়া যায়, সেটা ভীষণ ভাল লাগে।

—আচ্ছা! মনোরম খুব খেত না?

—খেত। কিন্তু তার সঙ্গে এটার কোনো সম্পর্ক নেই।

—জানি। সেদিনকার ঐ লম্বা ছেলেটা কে?

—বাঁক। আমার মামাশ্বশুরের ছেলে।

—তোমার মামাশ্বশুর? বলে মানস চেয়ে থাকে। খুব অবাক চোখ সাত, অবাক হওয়ার মতো কিছু খুঁজে না পেয়ে বলে—কী হল?

—মামাশ্বশুরের ছেলে?

—হ্যাঁ। দেওর।

—কী বলছো সৌ?

হঠাৎ খেয়াল হতে সীতা জিভ কাটে। ঠিক তো। তার আর কোনো মামাশ্বশুর নেই, দেওর নেই। মুখ নীচু করে একটু লাজুক ভঙ্গি করল সীতা।

—ভুল হয়ে গিয়েছিল।

মানসকে একটু পাঁশুটে দেখায়। সিগারেটটা আধখাওয়া করে ফেলে দিয়ে বলে—ঠিক আছে।

—না, ঠিক নেই। তুমি রাগ করেছো। সীতা একটু ঘন হয়ে বসে।

—রাগ করিনি। তবে কেমন একটু লাগে। তুমি ঠিক ভুলতে পারছো না।

—ভুলছি। এইমাত্র সব ভুলে গেলাম। দেখো, আর এরকম হবে না।

মানস একটু থমথমে মুখে বলে—ভুলবে কী করে, যদি কলকাতাময় মনোরমের আত্মীয়রা ছড়ানো থাকে!

—ওর বেশী আত্মীয় নেই।

—নেই?

—না। ওর বুড়ো বাবা—বলে তাকিয়ে একটু হাসে সীতা,

বলে—দেখ, শ্বশুর বলিনি কিন্তু।

মানস হাসে।

—ওর বুড়ো বাবা ওর ছোটোভাইয়ের কাছে থাকে দূরের এক মফঃস্বল শহরে। সে বাড়িতে আমি মোটে বার দুই গেছি! ও বেশী সম্পর্কও রাখত না। মা নেই। এখানে যারা আছে, তারা সব মামা, মাসী, পিসি গোছের। সে সব সম্পর্কও আল্‌গা হয়ে গেছে।

—তোমাকে আমি খুব দূরে নিয়ে গিয়ে থাকবো।

—কেন? ওর আত্মীয়দের ভয়ে?

—হু। আমার রেলের চাকরি। ইচ্ছে করলেই বদলী হতে পারি।

—আমার কলকাতা ভাল লাগে।

—কেন?

—আমার লাগে। একটা শখ আছে আমার, ঘুরে ঘুরে এ-জায়গা সে-জায়গা থেকে জিনিসপত্র কেনা। কিনতে যে কী ভীষণ ভাল লাগে! কলকাতা ছাড়া এরকম দোকান আর দোকান তো কোথাও নেই!

—আচ্ছা, তাহলে কলকাতাতেই থাকব। ফ্ল্যাট তো পেয়েছিই।

—আমি কিন্তু খুব জিনিস কিনি, আর ঠকে আসি।

—কিনো।

—ঠকলে বকবে না তো?

—না। মেয়েরা তো ঠকেই। কলকাতায় এই যে এত দোকান, এত ফিরিঅলা, এরা তো মেয়েদের ঠকিয়েই বেঁচে আছে।

—তুমি কত মেয়ে চেনো!

—একজনকে তো চিনি। তাকে চিনলেই সব চেনা হয়ে যায়।

—আমি একটা গ্লাটন। সামনে আস্ত একটা মুর্গীর রোস্ট, নীচু হয়ে সেটার গন্ধ শুঁকে বলল মানস।

—গ্লাটন মানে কী?

—লোভা। পেটুক।

—যাঃ। তুমি কি তাই?

—নয়?

—একদম না। তোমার শরীর আন্দাজে ওটুকু আবার খাওয়া নাকি! একটা তো এইটুকুন মাত্র মুর্গী!

—আস্ত মুর্গী।

—হোকগে।

—খাওয়া কমাবো, বুঝলে মৌ?

—কেন?

—তুমি খাবে এইটুকুন, আমি খাবো অ্যাতো, সেটা কি ভাল দেখাবে?

—মোটেই তুমি অ্যাতো খাও না।

—খাই।

—খাও, না খাও।

—তবে তুমি খাওয়া বাড়াও।

—মেয়েরা বেশী খেতে পারে না।

—কে বলেছে? এসপ্ল্যানেডে বিকেলের দিকে মেয়েরা যা গপাগপ ফুচকা খায় না, তোমরা বিশ খেতে পারবে না।

সীতা মুখে আঁচল তুলে হাসল।

—তুমি খাও না বলেই রোগা আর অ্যানিমিক।

—স্লিম থাকাই তো ভাল। মোটা মেয়েরা বেশী ভোগে। আমার কোনো অসুখ নেই।

—তোমার ঠিক অ্যানিমিয়া আছে। ডাক্তারের কাছে গেলেই ধরা পড়বে।

—থাকলে আছে।

—থাকবে কেন ?

—থাকলে অপছন্দ নাকি ? বিয়ে বাতিল করবে ?

দু'জনে দু'পলক পরস্পরের দিকে চেয়ে থেকে হেসে ফেলে।

—আইসক্রীমটা নাড়াচাড়া করছ যে, খাচ্ছো না।

—ভীষণ ঠাণ্ডা, দাঁত শিরশির করে। গলা বসে যাবে।

—তবে পকোড়া খাও।

—ভাল লাগছে না। তুমি খাও, আমি দেখি।

আস্তে ধীরে খাচ্ছিল মানস, মাঝে মাঝে তাকিয়ে হাসছিল। একদৃষ্টে চেয়ে ছিল সীতা। সুন্দর মেদহীন চৌকো পুরুষ মুখশ্রী। কাঁধ দুটো কদের ছড়ানো। মস্ত হাত। দেখতে ভাল লাগে। অনেকদিন ধরে দেখছে সীতা। তবু এ নতুন করে দেখা। এ ভাবে দেখা হয়নি। এই ডবলডেকারের মতো মানুষটার কাছে সে পাখির মতো ছোট্ট। বোধহয় মানসের মাথা কোনোদিনই বুকে নিতে হবে না সীতার। এবার উল্টো নিয়ম হবে। ওকেই পাখির মতো বুকে নিয়ে শুয়ে থাকবে লোকটা। সারা রাত।

হঠাৎ সীতা আস্তে করে বলে -তুমি স্বপ্ন দেখ না ?

—স্বপ্ন ? একটু হাঁ করে চেয়ে থাকে মানস। তারপর অনেকক্ষণ বাদে হাসে—স্বপ্ন, মৌ ? না, দেখি না। আমি খুব সাউণ্ড স্লীপার। কেন ?

—এমনিই। অনেকে ঘুমের মধ্যে কথা বলে।

—আগে থেকে সাবধান হচ্ছো ? ভয় নেই, ওসব হয় তাদের যারা স্নায়ুর রোগে ভোগে।

—তাই।

আবার চুপ। দু'জনেই। সীতা সাদা আঙুলে কাচের টেবিলে একটা শূন্য আঁকল। তারপর মুখ তুলে হাসল।

ট্যাক্সিটা বাঁক ঘুরতেই অন্ধকারের মধ্যে স্টীমারের মতো ঝলমল করে ওঠে ক্লাব। চারধারে যেন বা কালো নদী। স্টীমার চলেছে।

গাছগাছালিতে বাতাস মর্মরধ্বনি তুলছে। আলোকিত টেনিস-লন্। সাইটস্ক্রীনের আড়ালে বলে দেখা যায় না কিছু। হঠাৎ পক্ করে বলের শব্দ আসে।

আজও কেউ বড় একটা ফিরে তাকায় না। তারা সিঁড়ি বেয়ে ওঠে। টেবল-টেনিসের টেবিলে খুব ভীড় আজ। বহু খেলোয়াড়। চারদিকে বেয়ারাদের দ্রুত আনাগোনা।

মানস মুখ ফিরিয়ে হাসল। বলল—আজ শনিবার।

—তাতে কী?

—ভীড়।

—ও।

—শনিবারে কলকাতার মানুষ পাগল হয়ে যায়।

—আমরাও কি শনিবারের পাগল?

—না। চিরকালের।

করিডোরে একজন লোক শ্লথ পায়ে আগে আগে হাঁটছিল। কথা শুনেই বোধহয় ফিরে তাকাল। অচেনা লোক। খুব ফর্সা সুন্দর চেহারা, অবিকল সাহেবদের মতো। লালচে একজোড়া গোঁফ, লালচে চুল এলোমেলো হয়ে আছে মাথায়। মুখে সামান্য ক্লান্তির ছাপ। একটু হাসল কি লোকটা?

সীতা সিঁটিয়ে যাচ্ছিল। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল, সে কিছু অন্যায় করছে না। সে কোনো অপরাধ করেনি।

পিঠে মানসের আলতো হাত তাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিছু ভয় নেই।

ঘরটা খালিই ছিল। ঠিক আগের দিনের মতো। মানস দরজাটা আগেই বন্ধ করে দিল। ফিরে ইংগিতময় হাসি হাসল একটু। ঠিক সেই মুহূর্তেই সীতার মনে পড়ে, ক'দিন আগে কেটে

যাওয়া একটা টেলিফোন কল। লাইনটা কি কেটে গিয়েছিল সত্যিই? না কি কেউ দীর্ঘশ্বাসই কেবল শুনিয়েছিল তাকে?

ভ্রূ আপনা থেকেই কুঁচকে গেল সীতার।

—কী হল? কিছু ভাবছো? মানস প্রশ্ন করে।

সীতা উত্তর দেয় না। শুনতেই পায় না প্রশ্নটা।

ঘরের একদিকে চমৎকার একটা পুরোনো আমলের ড্রেসিং টেবিল। বেলজিয়ামের মসৃণ কাচ বসানো। সীতা ধীর পায়ে উঠে গিয়ে একটু দাঁড়াল আয়নার সামনে। অ্যানিমিক? বোধ হয়। তাকে খুব রোগা আর ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। মিছে কথা বলেছিল সীতা মানসকে। তার আজকাল খুব অম্বল হয়, মাথা ধরে। হয়তো খুব শীগ্‌গীরই অসুখ হবে। আমার অসুখ নেই, এ কথাটা খুব ভেবে বলেনি সে। একটু পিছনে দাঁড়িয়ে আছে মানস। এতক্ষণে ওর পোশাকটা লক্ষ্য করেনি সীতা তেমন করে। খুব ঝকঝকে একটা চেক প্যান্ট পরনে, গায়ে সাদা স্পোর্টস গেঞ্জি। বুকের চৌকো পাটা ফুটে আছে গেঞ্জির ওপর। বা কাঁধটা ভাঙা, একটু নোয়ানো। খুবই বড় শক্তিমানের চেহারা। ওর পাশে সে কি আধখানা, না সিকিভাগ?

মানস এগিয়ে আসে।

সীতা আস্তে করে বলে—তোমাদের দু'জনের খুব অদ্ভুত মিল।

—কাদের দু'জনের কথা বলছো?

—তোমার আর ওর।

—ও কে?

—মনোরম।

—মিল?

—দুটো খুব অদ্ভুত মিল।

—কী?

তোমাদের দুজনের নামই 'ম' দিয়ে শুরু। আর···

—আর ?

—তোমাদের হু'জনেরই একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল।

মানস এগিয়ে এসেছিল অনেকটা, তবু দূরত্ব ছিল একটু-খানি। সেই দূরত্বটা রয়েই গেল। মানসের মুখটা আস্তে আস্তে একটু গম্ভীর হয়ে যায়।

বলল —মৌ, আমাকে তুমি সিগারেট খাওয়া শিখিয়েছো কেন ?

—এমনিই। ভাল লাগে।

—না।

—তবে কেন ? অবাক হয়ে প্রশ্ন করে সীতা।

—মনোরমের সঙ্গে আমার আরো মিল বের করতে।

—তার মানে ?

—তুমি কি আমার মধ্যে মনোরমকেই চাও ?

সীতা মূক হয়ে গেল।

পাঁচ

—ঝুমু, তুই বাসাটা ছেড়ে দে। আমার বাড়িতে চলে আয়। যা বাকী বকেয়া পড়েছে তা আমি দিয়ে দেবো।

—কেন?

—ওয়াচ হিম। ওয়াচ হিজ স্টেপস।

—কোনো লাভ নেই।

—কেন?

—ওর ভিতরে কিছু সাহেবী ব্যাপার ঢুকে গেছে।

—সেটা কী?

—সব বুঝবার তোমার দরকার কী?

—আমার ছেলে, আর আমার বুঝবার দরকার নেই?

—জেনারেশন গ্যাপ বোঝো?

—বুঝবো না কেন? বুঝি কিন্তু মানি না। ওসব বানানো কথা।

—হবে।

—ঝুমু আমার কেবলই মনে হয় ও শীগগিরই নিজেকে শেষ করবে।

মনোরম চুপ করে থাকে।

- তুই সব সময়ে আমার আর ওর কাছাকাছি থাক ঝুমু।

—মানুষ তো আমি একটা, দু'জনের কাছে থাকবো কী করে?

—সময় ভাগ করে নে। না, বরং তুই ওর কাছে কাছেই থাক। ওরই বিপদ বেশী।

—এ কথা বলছ কেন? কিসের বিপদ?

—ও তো কিছু বলে না, কিন্তু মনে হয়, ও একটা প্রবলেমের

মধ্যে আছে।

—প্রবলেমের মধ্যে সবাই আছে।

—কিন্তু বীরুর তো প্রবলেমের কোনো কারণ নেই? ভেবে পাই না, ওর প্রবলেমের কী থাকতে পারে। তাই মনে হয়, ওর বড় বিপদ।

বিপদ? না কিছুই খুঁজে পায় না, ভেবে পায় না মনোরম। ও খারাপ মেয়েমানুষের কাছে যায় না যে রোগ নিয়ে আসবে। ওর মেয়েবন্ধুরা অভিজাত পরিবারের। অবৈধ সন্তানের ভয় নেই, খোলা বাজারে বিক্রী হয় কণ্ট্রাসেপটিভ্। ওর প্রেমের কোনো ঝামেলা নেই, কারণ ঘুমের সময়ে ওর কারো মুখ মনে পড়ে না। জুয়ায় অনেক টাকা হেরে গেলেও ওর অনেক থাকবে।

প্রবলেমটা খুজে পায় না বটে মনোরম, কিন্তু খুজে ফেরে। দিশি গাড়িটা নিয়ে সে ক্লান্তিহীন ছোটে বীরুর পিছনে। বীরু মুহুর্মুহু পোশাক কেনে, কেনে গ্রামোফোনের উত্তেজক ডিস্ক, ভাল হোটেলে খায়, নাচে, খেলে বেড়ায় বড় ছোটো ক্লাবে, সাঁতরায়, মেয়েদের নিয়ে যায় অ্যাপার্টমেণ্টে, মনোরম সারা কলকাতা বীরুর ফিয়াটটাকে তাড়া করে ফেরে। বীরু বিতর্কসভায় বক্তৃতা করে, ভিয়েৎনামে মার্কিন বোমারু বিমানের কাণ্ডকারখানার হুবহু বর্ণনা দেয়, লাইফ ম্যাগাজিনের পাতা খুলে জনসাধারণকে দেখায় মিলাই হত্যাকাণ্ডের মর্মন্তুদ ছবি। কিন্তু কোথাও থেমে নেই বীরু। চলছে। চলবে।

অনেক রাতে যখন বাসায় ফেরে মনোরম, তখন ক্লান্ত লাগে। বড় ক্লান্ত লাগে। রাতে সে প্রায় কিছুই খায় না। দুধে পাঁউরুটি ভিজিয়ে বিস্বাদ দলাগুলি গিলে ফেলে। দু' ঘরেই জ্বেলে দেয় টিউবলাইটগুলি। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খায়। মাঝে মাঝে ওপরের দিকে চেয়ে দেখে।

কী দেখে মনোরম? দেখে নীল্‌চে স্বপ্নের আলো। জানালার বুটিদার পর্দাগুলি উড়ছে বাতাসে। ঠিক মনে হয়, ঘরের ভিতরে

রয়েছে তার প্রিয় মেয়েমানুষটি। সে কে? রিনা? চপলা? না কি এক প্রাণহীন মেমসাহেব পুতুল প্রাণ পেয়ে ঘুরছে তার শূন্য ঘরে? সীতা নয় তো?

রক্তমাংসময় একজনকেই পেয়েছিল মনোরম। সীতা। যতক্ষণ সিগারেট না শেষ হয়, ততক্ষণ রাস্তায় পায়চারি করে সে। কখনো দুটো তিনটে সিগারেট ফুরিয়ে যায়। হাঁটতে হাঁটতে কথা বলে মনোরম। কাল্পনিক কথা, এক কাল্পনিক স্ত্রীর সঙ্গে। মাঝে মাঝে হাঁটতে হাঁটতে থেমে যায়। কল্পনাটা এমনই সত্যের মত জোরালো হয়ে ওঠে যে তার ইডিও-মোটর অ্যাকশন হতে থাকে। গভীর রাতের নির্জন পূর্ণদাস রোডে কেউ তার সেই মূকাভিনয় দেখে না। (দেখলে তারা দেখত, একজন প্রেমিক কেমন তার শূন্য-নির্মিত নায়িকার সঙ্গে অবিকল আসল মানুষের মতো প্রেম করে।)

রাত গভীর হলে সে তার ছয় বাই সাত খাটে গিয়ে শোয়। মস্ত খাট। বিছানাটা একটু স্যাঁতসেঁতে। ফুটপাথ থেকে দু' টাকা জমা রেখে আট আনা ভাড়ায় আনা ডিটেকটিভ বই খুলে বসে। হাই ওঠে। জল খায়। টেবিল ল্যাম্প নেবায়। শেষ সিগারেট-টাকে পিষে মারে মেঝের ওপর। তারপর ঘুমোবার জন্য চোখ বোজে।

অমনি কল্পনায় ভিন্ন পৃথিবী জেগে উঠতে থাকে। শরীরের ভিতরে নিকষ কালো অন্ধকারে জ্বলে ওঠে নীল লাল স্বপ্নের আলো। অবিকল এক জনহীন প্রেক্ষাগৃহ। আসবাব টানাটানি করে কারা পর্দার ওপাশে মঞ্চে দৃশ্যপট সাজাচ্ছে। পর্দা সরে যায়। দীর্ঘ পৈঠার মতো ইস্কুলবাড়ির কয়েক ধাপ সিঁড়ি। তাতে তিনশো ছেলে দাঁড়িয়ে গায়—জয় জগদীশ হরে······

শূন্য বিছানায় তার প্রসারিত হাতখানা পড়ে থাকে। কিছুই স্পর্শ করে না।

সকাল দশটা থেকে কাঠগোলা। মাঝখানে একটু লাঞ্চ ব্রেক্।

মামাবাড়ি থেকে ভাত আসে। মামা-ভাগ্নে খায়। খেতে খেতে মামা বলে—ঝুমু, ওয়াচ্ হিম্।

আজকাল বাঙালীর কথা মামা ভুলে যাচ্ছে। নেতাজীর কথাও। নিরুদ্দেশ সেই মানুষটির জন্য আর অপেক্ষা করতে ভয় পায় মামা। ফার্স্ট স্ট্রোক হয়ে গেছে। বীরু থেকে যাচ্ছে বিপদসঙ্কুল পৃথিবীতে।

ফিস্ ফিস্ করে একটা লোক কানের কাছে বলে—ব্যানার্জি না?

তখন বীরু তার গাড়িটা রেখে দ্রুতবেগে ঢুকে যাচ্ছে স্টক এক্সচেঞ্জে। অনুসরণ করতে করতে বাধা পেয়ে মনোরম থেমে ফিরে তাকায়। চিনতে পারে না। মস্ত একটা কাঠামোয় নড়বড় করে তুল্‌তুলে মাংস আর চামড়া। চোখের নীচে কালি। ক্লান্ত মানুষ একটা।

টেলিফোনে যেমন শোনা যায় মানুষের গলা, তেমনি, ফিস্‌ফিসিয়ে বলে—বিসোয়াস্ হিয়ার।

—বিশ্বাস! কী হয়েছে, চেনা যায় না?

—বলছি। খুব ব্যস্ত?

মনোরম মুখটা একটু বাঁকা করে হাসে—না। জাস্ট্ একজনকে চেজ্ করছিলাম।

—চেজ্?

—অলমোস্ট ডিটেকশন জব্। জিরো জিরো সেভেন।

—কাকে?

—এক বড়লোকের লক্কা ছেলেকে।

বিশ্বাস ক্ষীণ একটু হাসল—চা খাবেন?

—চা? বিশ্বাস, চায়ের কথা বলছেন? আপনাকে দেখেই একটা তেষ্টা পেয়েছিল, উবে গেল। অফ্ অল্ থিংস গরমের দুপুরে চা কেন?

—দি ওয়ার্ল্ড ইজ লস্ট ব্যানার্জি।

—কী হয়েছে ?

—স্ট্রোক।

বিশ্বাস জোর করে চায়ের দোকানে নিয়ে গেল। বসল জন।

—স্ট্রোক ? মনোরম বলে।

—স্ট্রোক।

—ব্যাপারটা কীরকম হয় বিশ্বাস ?

—স্ট্যাবিং-এর মতো। বুকে। বিশ্বাস করবেন না। মনে। এতগুলো স্ট্যাবিং যদি বুকে হচ্ছেই, তবে মরছি না কেন ?

—হুঁ ?

—বিশ্বাস করবেন না। মৃত্যুযন্ত্রণা তবু মৃত্যু নয়। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। তার ওপর ডায়েবেটিসটাও ধরে রেখেছে দুই বছর। হাঁটাচলা ছিল না তো, কেবল গদি দাবড়াতাম। ব্যানার্জি, আপনার সঙ্গে কথা আছে।

—শুনছি।

—আপনি একটা ওপেনিং চেয়েছিলেন। ম্যানেজারি নেবেন ?

—ম্যানেজারি, বিশ্বাস ? এ নিয়ে গোটা দুই করেছি, কোনোটাতেই সুবিধে করতে পারিনি। আপনারটা থার্ড হবে।

—আমার ম্যানেজারিতে পারবেন। আমি বদ হলেও, কথা দিলে কথা রাখি।

—টার্মস্ অ্যাণ্ড কণ্ডিশন ?

—জানেন তো ব্যানার্জি, আমার বিজনেস খুব ক্লিন্ নয়! কিছু গোস্ট্ মানি খেলা করে। কাজেই—

—কী ?

—ওয়াচ্ ইওর স্টেপ্স।

—সেই বসিদের বিজনেসটাও কি এর মধ্যে ?

—এভ্রিথিং। আমার ব্যবসাগুলো ছোটো, প্রত্যেকটার জন্য আলাদা ম্যানেজার রাখব কী করে? তবে টাকা দেবো, ওভার অল্ প্রায় সার্তশ। কিন্তু খুব সাবধানে হ্যাণ্ডেল করবেন। কী, রাজী?

—দেখি।

—দেখি-টেখি নয়। আমি লোক খুঁজছি কতদিন ধরে। আজই কথা দিয়ে দিন।

—বিশ্বাস, এখন আমি যে চাকরিটা করছি তাতে আমি টায়ার্ড, একটা অল্পবয়সী ছেলেকে দিনরাত চেজ্ করা, ওর মতো স্পীড আমার নেই, হাঁফিয়ে পড়ি।

—চেজ্ করেন কেন?

—ওয়াচ করার জন্য, যাতে সে বিপদে না পড়ে। বিপদ কিছু নেই, তবু তার বাবার ধারণা সে বিপদে পড়বেই। তাই।

—খুব ফাস্ট্ লাইফ লীড্ করে?

—খুব। আমাব এমপ্লয়ারের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই।

—আচ্ছা, কবে আসছেন?

—শীগগিরই।

—কিন্তু মনে রাখবেন, আমার ম্যানেজারি কিন্তু অন্ধকার জগতে। এভরিথিং ব্ল্যাক।

—জানি বিশ্বাস। চলি।

—শীগগিরই আসছেন?

—হুঁ।

মনোবম বিদায় নেয়।

আবার একদিন বীরুর পিছু নিয়ে সে এসে পড়ে সমীবেব অফিসের সামনে। জোহানসন অ্যাণ্ড রো-র সাদা সম্ভ্রান্ত অফিস বাড়িটা। বীরুকে কলকাতার ভীড়ে হারিয়ে যেতে দিয়ে মনে

গাড়ি পার্ক্ করে। নামে। আঙুলে গাড়ির চাবিটা ঘোরাতে ঘোরাতে ঢুকে যায় ভিতরে।

সমীর ঠিক সেদিনের মতোই সুকুমার কোমল মুখশ্রী তুলে বলে—আরে মনোরম!

মনোরম হাসে—কী খবর?

—তোমার খবর কী?

—একরকম।

—বোসো। চা খাও।

—না। আমি কাজে আছি।

—বোসো, একটু কথা আছে।

—কী?

—সীতার সঙ্গে আমার কিছু কথা হয়েছে।

—কিসের?

—তুমি তো জানোই যে ও বিয়ে করছে।

—আন্দাজ করেছিলাম। মানসকে?

—মানসকে। সীতা চাইছে তোমার বিজনেস-টিজনেস যা আছে ওর নামে, সব তোমাকে ফিরিয়ে দেয়।

—ফিরিয়ে দেবে? তবে নিল কেন?

—মানুষ তো ভুল করেই! ও বলছিল, এসব যতদিন না ফেরত দিচ্ছে, ততদিন ও তোমাকে ভুলতে পারছে না। কাজেই তোমাকে ও অনুরোধ জানাচ্ছে, তুমি নাও। অভিমান কোরো না।

মাথাটা নীচু হয়ে আসে মনোরমের। সে কাচের নীচে সেই ছবিটা দেখতে পায়। বনভূমি, তাতে শেষবেলার রাঙা রোদ, উপুড় হয়ে পড়ে আছে কয়েকটা গরুর গাড়ি। আদিবাসী পুরুষ ও রমণীরা রাঁধছে।

সে মুখ তুলে বলল—এসব জায়গায় আমি অনেকবার গেছি।

—কোন্ জায়গার কথা বলছো?

—এই যে ছবিতে। সাঁওতাল পরগণা, বিহার, উড়িষ্যায়

এরকম সব অদ্ভুত বনে-জঙ্গলে আমি একসময়ে খুব ঘুরে বেড়াতাম।

সমীর করুণ চোখে চেয়ে থাকে।

—বিয়েটা কবে ?

—ওরা খুব দেরি করবে না। মানস বোধহয় বদলি হয়ে যাচ্ছে আগ্রায়। বিয়ের পরেই সেখানে চলে যাবে। আমি সীতাকে কী বলব মনোরম ? তুমি তো জানো, আমি কোনো ব্যাপারে নিজেকে জড়াই না। কিন্তু এ ব্যাপারটা নিয়ে সীতা এত কান্নাকাটি করেছিল যে, আমি কথা দিয়েছি তোমাকে কমিউনিকেট করব। তুমি না এলে আমিই যেতাম।

—কিছু ভাবিনি এখনো। দেখি।

—ও খুব শান্তিতে নেই।

(মনোরম মনে মনে বলে—যতদিন পৃথিবীতে বনভূমি থাকবে, নদীর জলে শব্দ হবে, ততদিন ভুলবে না। জ্বলবে।)

বিদায় না নিয়েই একটু অন্যমনস্কভাবে বেরিয়ে এল মনোরম।

ট্রাম কোম্পানির বুথ থেকে টেলিফোন করল সীতার বাড়িতে। রিং-এর শব্দ হচ্ছে। শ্বাসকষ্ট হতে থাকে মনোরমের। সীতা কি কথা বলবে তার সঙ্গে ? এরকম ঘটনা ঘটবে কি ?

মেয়েলী মিষ্টি গলায় ভেসে আসে 'হ্যালো'।

—সীতা! দম বন্ধ হয়ে আসে মনোরমের। বুকে উত্তাল ঢেউ।

—ধরুন, ডেকে দিচ্ছি।

একটু পরে সীতা বলল—হ্যালো।

মনোরম কিছু বলতে পারে না প্রথমে।

সীতার গলাটা হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে—কে ?

মনোরম চোখ বুজে, আস্তে আস্তে বলে যায়—মেরিলি র‍্যাং দ্য বেল, অ্যাণ্ড দে ওয়্যার ওয়েড······

—কে ? চীৎকার করে উঠে সীতা!

মনোরম ফোন রেখে দেয়।

ডিভোর্সের পর এক বছর পূর্ণ হয়ে গেছে কবে! সময় কত তাড়াতাড়ি যায়।

সীতা সব ফিরিয়ে দিচ্ছে। খুশী হবারই কথা মনোরমের। মামার গাড়িটা নিয়ে বাড়িকে তাড়া করতে করতে এক সময়ে ক্লান্তি লাগে তার। পিছু নেওয়া ছেড়ে সে গাড়ি ঘুরিয়ে নেয় অন্য রাস্তায়। আপনমনে ঘুরে বেড়ায়।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে এল চাঁদনী চকে। তার দোকানটা এখানেই। নেমে সে দোকানঘরে উঠে এল। মনোরমের আমলে সাকল্যে চারজন কর্মচারী ছিল। এখন বেড়েছে। পুরনোরা কেউ নেই। চমৎকার সানমাইকা লাগানো কাউন্টার, দেয়াল ডিসটেম্পার করা, ডিসপ্লে বোর্ড, কাচের আলমারি। সীতার দাদা ব্যবসা ভালই বোঝে। অনেকটা বড় হয়েছে দোকান। রমরম করে চলছে। ভাল জামাকাপড় পরা একজন অল্পবয়সী ছোকরা কাউন্টারের ওপর কনুইয়ের ভর রেখে কাঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মনোরমকে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল—বলুন।

মনোরম গ্রাহ্য করল না। চারদিকে চেয়ে দোকানঘরটা দেখল। দোকানের নাম এখনো এস ব্যানার্জি প্রাইভেট লিমিটেড। সীতা এখনো ব্যানার্জি নামে সই করে। আপনমনে একটু হাসে মনোরম। কাউন্টারের ছেলেটা চেয়ে থাকে।

বাইরে একটা টেম্পো থেমেছে। কুলিরা মাল তুলে দিয়ে যাচ্ছে দোকানে। ছেলেটা ওপাশটায় গেল।

একা দাঁড়িয়ে থাকে মনোরম। এই দোকান-টোকান সবই সে উপহার দিয়েছিল সীতাকে। কিছু আয়কর ফাঁকি দিয়েছিল বটে, তবু তার ব্যবসাটা ছিল পরিষ্কার, দাগহীন এবং সৎ। এসব আবার তাকে ফিরিয়ে দিলে সীতা তাকে ভুলে যেতে পারবে।

পারবে কি ?

কেন ভুলতে দেবে মনোরম ? দেবে না। সে ফিরিয়ে নেবে না কিছুই। বিছানায় যখন মানস ঝুঁকে পড়বে সীতার ওপর, একদিন চুপি চুপি ঠিক মানসের শরীরে ভর করবে মনোরম। ভূতের মতো। থাক। মনোবম কিছুই ফিরিয়ে নেবে না। তার চেয়ে সে বিশ্বাসেব অন্ধকার, বিপজ্জনক ব্যবসায় নেমে যাবে।

একটু দাঁড়িয়ে থাকে। তারপব বেরিয়ে এসে গাড়ি ছাড়ে সে। মনটা হঠাৎ ভাল লাগে। আজ সে সম্পূর্ণ দাবি-দাওয়া ছেড়ে দিতে পারল।

সমীরকে ফোন করল সে।

—শুনুন, আমি বিজনেস ফেবৎ নেবো না। কিছুই নেবো না।

—কেন মনোরম ?

—শুনুন, আপনি হয়তো ঠিক বুঝবেন না ব্যাপারটা। তবু বলছি। সীতা ব্যবসা কেড়ে নিযে আমাব ক্ষতিই করতে চেয়েছিল। ম্যানেজারি থেকে ববখাস্ত কবেছিল আমাকে। কিন্তু তাতে ক্ষতি কিছু হযনি। আমি মবে যাইনি। সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটা মানুষেব হয় তা টাকাপয়সার নয়, বিষয় সম্পত্তিরও নয়। মানুষ হারায় তার সময়।

—কী বলছো, বুঝতে পারছি না।

—আমার হাবিয়েছে, ক্ষতি হয়েছে কেবলমাত্র সময়ের। সীতা আমাব বিজনেস ফিবিয়ে দিতে পাবে, কিন্তু হারানো সময়টা কে ফিরিয়ে দেবে ? এক বছবে আমার বয়স বেড়ে গেছে ঢের। কিছু শুরু করব আবার, তা হয় না। আমি পারব না। ওকে বলে দেবেন।

—তুমি আর একবার ভেবে দেখ।

—একবার কেন ? আমি আরো বহুবার ভাবব, সারাজীবন ধরে। কিন্তু তাতে লাভ হবে না। আমি আমার এক বন্ধুর

ব্যবসায়ে নামছি। ব্যবসা বন্ধুর, আমি সেখানে চাকরি করব। অ্যাণ্ড ছ্যাট্স অল্।

ফোনটা করে খুবই শান্তি পায় মনোরম।

—তুই আমাকে ছেড়ে যেতে চাস রুমু? মামা একদিন ক্লান্ত বিষণ্ণ গলায় বলে। মামার রোগা চেহারাটা আরো একটু ভেঙে গেছে। চোখের নীচে মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম কালো রেখা সব ফুটে উঠেছে। সম্ভবত শীগ্গিরই আবার স্ট্রোক হবে মামার।

—বীরুর সঙ্গে পাল্লা দিতে আমি কি পারি মামা? ওর কত কম বয়েস, কত স্পীড ওর। কত জায়গায় ছড়িয়ে আছে বীরু! আমি কি পারি পাল্লা দিতে? আমার বয়সও হল।

—কিন্তু তুই-ই বীরুকে ফেরাতে পারিস। আমি দেখেছি ও তোর সঙ্গে কথা-টথা বলে, হাসে, ঠাট্টা করে। অবিশ্বাস্য। ও যে কারো সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে পারে তা জানতামই না। আমার বড় আশা ছিল, তুই কিছু একটা পারবি।

মনোরম একটু ভেবেচিন্তে বলে—মামা, বীরুর পিছু-নেওয়ার চাকরি একদিন তো শেষ হবেই। একদিন বীরু ঠিকই ব্যবসা-ট্যবসা বুঝে নেবে। তখন আমার চাকরিও শেষ হয়ে যাবে।

—না। তোকে আমি ম্যানেজার করব।

—কেন করবে? আমি যে কাঠের কিছুই জানি না। কিছুই শিখলাম না। বীরু মালিক হলে যে আমাকে রাখবে তারও কিছু ঠিক নেই। বয়সও হয়ে যাবে ততদিনে। পথ বন্ধ হয়ে যাবে সব। তার চেয়ে এখনই আমাকে ছেড়ে দাও।

—যেখানে যাচ্ছিস সেখানেও তো চাকরিই করবি।

—প্রথমে তাই কথা ছিল। পরে আমি কষাকষি করে আমাকে ওয়ার্কিং পার্টনার হিসেবে নিতে রাজি করিয়েছি। কমিশন পাবো।

—কীরকম ব্যবসা ?

—ব্ল্যাক। ভীষণ কালো। জাল-জোচ্চুরি-স্মাগলিং সবই আছে।

—যাবি ?

যাবো না কেন ? আমার এ বয়সে আর ভাল বা খারাপ কিছু হওয়ার নেই।

-যাবিই ? বাবুর একটা কিছু ব্যবস্থা করে যা। ওকে ফেরা।

—কোথায় ফেরাবো মামা ? আমার তো ওকে কিছু শেখানোর নেই। ও আমার চেয়ে দশগুণ বেশী পড়াশুনো করেছে। অনেক বেশী বুদ্ধিমান। ভয়ংকর আত্মবিশ্বাসী। ওকে আমি কোথায় ফেরাবো ? ও আমাকে টপকিয়ে বেরিয়ে যাবে। বরং ও-ই আমাকে টেনে নিচ্ছে ওর দিকে। দেখ, এই বয়সে আমি লম্বা চুল আর জুলফি রাখছি, পরছি বেলবটমের সাথে পাঞ্জাবি। আর কিছুদিন বাবুর কাছে থাকলে আমিই বাবু হয়ে যাবো।

—আর কি তুমি না থাকলে ঝুমু। আমার জন্যই থাক।

—আমার বাড়িভাড়াটা এখনো বাকী পড়ে আছে মামা।

—আজই নিয়ে যাস। ভূপতিকে বলে রাখছি। থাকবি ? কিছুদিন ?

—না। বিশ্বাসকে একটা খবর দিয়ে দিতে হবে। ওরও স্ট্রোক, খুব ভেঙে পড়েছে। সময় দিতে চাইছে না।

—ঐ বিপদের ব্যবসাতে কেন যাবি ঝুমু ?

—কিছু তো করতেই হবে মামা। ওপনিং কোথায় ? বাজার তো দেখছো ! তাছাড়া বিপদই বা কী, সবাই করছে।

মামা খুব গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আস্তে করে বলে—তোর সঙ্গে তো তেমন সম্পর্ক ছিল না আমার। আজকাল আত্মীয়তার গিঁট তো আলগা হয়েই যাচ্ছে। কিন্তু এ কদিনে তোর ওপর আমার মায়া পড়ে গেছে ঝুমু। তুই চলে যাবি ভাবলে বুকটা

কেমন করে। আমি কেবল তোকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করলাম। তোর দিকটা ভাবিনি। ঝুমু তোর জন্য কী করব বল তো ?

—কী করবে ? আমার খুব অসময়ে তুমি আমার জন্য অনেক করেছো। ডোণ্ট বি সেন্টিমেন্টাল।

—স্ট্রোক-ফোক হলে ঐ সেন্টিমেন্টটা খুব বেড়ে যায়, জানিস ? ভীষণ বেড়ে যায়। স্ট্রোক হচ্ছে গাড়ি ছাড়বার ফার্স্ট ওয়ার্নিং, তখনই মানুষ গাড়ির জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বেশী করে আত্মীয়দের মুখ দেখে নেয়।

—চুপ করো। বিরক্ত হয়ে মনোরম উঠে যায়। কাঠগোলার পিছনে একটু পরিষ্কার জায়গায় গিয়ে সিগারেট ধরায়। করাত-কলের মিষ্টি ঘষটানো শব্দটা আসে।

বর্ষা যায়। শরৎ যায়। শীত আসি-আসি করে। বিশ্বাস ফোনে তার ফিস্-ফিস্ স্বরে বলে -ব্যানার্জি, আর কত সময় নেবেন ? আমি আর পারছি না।

—আর কটা দিন, বিশ্বাস। মনোরম বলে—আর একটু সময় দিন।

—সময় কে কাকে দেয় মশাই ! সময়ের কি ট্র্যানজাকশন হয় ? সময় ফুরোয়। ব্যানার্জি, একটা ফাইনাল কিছু বলুন। অন্য লোক নিতে ভরসা হয় না। এ ব্যবসাতে ফেইথফুল লোক না হলে⋯ ⋯ আমি আর কত অপেক্ষা করব ব্যানার্জি ? টেল্ সামথিং।

—একটু, আর একটু⋯⋯

আজকাল প্রায়ই একটা জিনিস লক্ষ্য করে মনোরম। বীরু মাঝে মাঝে তার ফিয়াট দাঁড় করায় অষুধের দোকানের সামনে। কী যেন কিনে আনে, তারপর আবার গাড়ি ছাড়ে। প্রায় দিনই,

প্রতিদিনই বীরু আজকাল কাণ্ডটা করে।

কী কেনে ও? ঘুমের ওষুধ নয় তো!

মনোরম সতর্ক হতে থাকে। একদিন বীরু অষুধের দোকান থেকে বেরিয়ে গাড়ি ছাড়ল। মনোরম গাড়ি থেকে নেমে ঢুকল দোকানটায়।

—একটু আগে যে লম্বা ছেলেটা এসেছিল, ও কিছু কিনল?

কাউন্টারের আধবুড়ো লোকটা কাগজ পড়ছিল। মুখ তুলে একটু বিস্ময়ভবে বলে—হু।

—কী?

—অনেকগুলো ট্র্যাংকুলাইজার, কয়েকটা ঘুমেব ওষুধ, নিউরো-সিসের জন্য কয়েকরকমের বড়ি।

—প্রেস্‌ক্রিপশন?

—ছিল না। এসব কিনতে আজকাল আর প্রেসক্রিপশন লাগে না। সবাই নিজের নিজেব ডাক্তার।

—অসুখটা কী?

লোকটা মাথা নাড়ল—কে জানে মশাই! জিজ্ঞেস করছেন কেন?

—কাবণ আছে। ও একটু ডিস্‌ব্যালান্সড।

লোকটা নিজের নাকটা মুঠোয় ধবে বলল—এসব ড্রাগই আজকাল মুড়িমুড়কিব মতো বিক্রী হচ্ছে। রোগটা বোধহয় পাগলামি। দেশে পাগল বাড়ছে।

মনোবম বেবিযে আসে। আকাশভবা রোদ। এখন হেমন্তকাল। কলকাতা এখন পাখিব বুকের মতো কবোষ্ণ। গাড়ি চালিয়ে চালিয়ে তার কাঁধে ব্যথা, কোমর ধরে আছে, মাথা ভার। হেমন্তের সুন্দর আলোতে কলকাতার বাস্তায় রাস্তায় একটু হেঁটে বেড়াতে পাবলে বেশ হত। কিন্তু জগদ্দল গাড়িটা রয়েছে সঙ্গে আর সামনে উধাও বীরু।

ক্লান্তভাবে আবার গাড়িতে ওঠে সে। ছাড়ে। ক্লান্তিহীন

বীরু কি ধরা পড়ল বয়সের হাতে? নাকি অসুখ? কিংবা কর্মফল? অষুধ কিনছে। পাগলামির ওষুধ, নার্ভের অষুধ, ঘুমের অষুধ! বড় অবাক কাণ্ড। মনোরমের ভ্রু কুঁচকে যায়। চিন্তিতভাবে সে চেয়ে থাকে সামনের রাস্তায়। চলন্ত গাড়িটা গিলে ফেলছে রাস্তাকে।

রাতে খুব জ্যোৎস্না ফুটেছে আজ। সেটা টের পাওয়ার কথা নয়। বীরুর পিছু পিছু অনেক রাত পর্যন্ত ধাওয়া করে করে অবশেষে প্রায় রাত সাড়ে বারোটায় বীরুর গাড়ি ঢুকল রিচি রোডে। তখন লোডশেডিং। সেই অন্ধকারে হঠাৎ বানডাকা জ্যোৎস্না দেখতে পেল মনোরম।

অ্যাপার্টমেন্টের সামনে বীরু গাড়ি দাঁড় করাল না আজ। একটু এগিয়ে গেল। বাঁ ধারে একটা মস্ত ফাঁকা পার্ক। হিম পড়েছে। কেউ কোথাও নেই। বীরু নামল। দুধের মতো সাদা পোশাক পরেছে বীরু। সাদা ঢিলে বুশশার্ট, সাদা প্যান্ট, সাদা জুতো। জ্যোৎস্নায় ওর লম্বা, সাদা অবয়বটা অপ্রাকৃত দেখায়।

গাড়ি ফেলে রেখে বীরু লম্বা পায়ে রেলিং ডিঙিয়ে পার্কে ঢুকল। খুব ধীরে হাঁটছে। মাঠের মাঝখানে চলে গেল। দাঁড়াল। আড়মোড়া ভাঙছে। স্লো-মোশন ছবির মতো নড়াচড়া করছে। জ্যোৎস্নায় এবং কুয়াশায় একটু আবছা। গাড়ির অন্ধকারে বসে মনোরম দেখতে থাকে। বীরু এক-পা এক-পা করে দৌড়ে ক্রিকেটের বোলারের মত হাত ঘোরাল। ব্যাটস্‌ম্যানের মতো মারল বল। দু' পায়ে একটা জটিল দ্রুত নাচ নেচেই থেমে যায়। ডিস্‌কাস্‌ ছোড়ার ভঙ্গি করে। তারপর ধীরে, খুব ধীরে হাঁটে, ঠিক যেমন চাঁদের মাটিতে নীল আর্মস্ট্রং হেঁটেছিল। ঘুরে দাঁড়ায় আবার। স্পষ্ট দেখা যায় না, কিন্তু মনে হয় যেন

চেয়ে আছে মনোরমের গাড়ির দিকেই। দেখছে।

মনোরম গাড়ির দরজা খুলে নামল। গরম জামা পরেনি, একটু শীত করে। রেলিংটা টপকায় মনোরম। হাঁটতে থাকে। কী জ্যোৎস্না, কী জ্যোৎস্না! নীলাভ হলুদ কুয়াশায় মাখা স্বপ্নের আলো। সেই আলোতে ভিন্ন গ্রহ থেকে আসা অপরিচিত মানুষের মতো লম্বা সাদা অবয়ব বাব্রুর। স্থির দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে মহাকাশের সাদা পোশাক।

—বীরু।

—এসো। ভাবছিলাম, তোমাকে ডাকব।

—তুই জানিস যে আমি তোর পিছু নিই?

—আগে জানতাম না। ক'দিন হল জানি। জেনেও প্রথম ভেবেছিলাম অচেনা কেউ চেজ্ করছে। তাই একটু চমকে গিয়েছিলাম। তারপর লক্ষ্য করলাম, তুমি।

—আমার দোষ নেই। মামার অর্ডার।

—বাবা কিছু জানতে চায়?

—চায়।

—আমাকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দিতাম। এত কষ্ট করতে হত না তোমাকে।

—কষ্ট কি? এটাই আমার চাকরি।

—বুঝতে পারছি। তোমার জন্য কষ্ট হয়।

—মামা যেদিন তোর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবে, সেদিন আমার এ চাকরিটা শেষ হবে। তখন হয়তো আমি কাঠগোলার ম্যানেজারি পাবো। নয়তো একটা বাজে, বিপজ্জনক অসৎ ব্যবসাতে নেমে যাবো। ও দুটো চাকরির চেয়ে এটা বোধ হয় একটু বেটার ছিল। তবে ক্লান্তিকর। তুই বড্ড স্পীডী।

বীরু তেমনি ধীর ভঙ্গিতে একটু হাঁটছে এদিক ওদিক। অদ্ভুত প্রাকৃতিক আলোতে ও হাঁটছে বলে মনে হয় না। যেন একটু জমাট, লম্বাটে একটা কুয়াশার তৈরী ভৌতিক মূর্তি দুলে

ফুলে যাচ্ছে।

—বাবা কোনোদিনই আমার সব জানতে পারবে না।

—সেটা মামা স্বীকার করে না। কিন্তু বোঝে। তাই আমাকে লাগিয়েছে মামা। তার বিশ্বাস, আমি তোমাকে বুঝবো। তোর পিছু নিয়ে নিয়ে আমি এখন পাক্কা জেমস বণ্ড হয়ে গেছি।

বীরু হাসল। মসৃণ কামানো গালে জোৎস্না ঝিকিয়ে ওঠে একটু।

—তুমি কী বুঝলে? শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করে বীরু।

—কিছু না।

—কী বুঝতে চাও?

—তুই অষুধ কিনছিস কেন? ওসব অষুধ প্রেসক্রিপশন ছাড়া খাওয়া খুব ডেঞ্জারাস।

—আজকাল সব অষুধের পোটেন্সি এত কমিয়ে দেয় ওরা যে কাজ হয় না।

ধীরে ধীরে হেঁটে বীরু একটু দূরে যায়। আবার দুলে দুলে কাছে আসে। মনোরমের ভয় হয়, বুঝি বীরু জোৎস্না আর কুয়াশায় হঠাৎ মিলিয়ে যাবে।

—বিয়ে করবি না বীরু?

—করব হয়তো কখনো।

—গৌরীকে করিস।

বীরু হাসল। বলল—তুমিই গৌরীর প্রেমে পড়ে গেছ।

—বোধহয়। তুই বলেছিলি কষ্ট হওয়াকেই ভালবাসা বলে। আমারও কষ্ট হয় ঐ মেয়েটার জন্য।

—বিয়ে করে কী হবে?

—আমি তোর অনেক কিছু নকল করেছি বীরু। পোশাক, চুল, জুলফি, গাড়ির স্পীড। তোর পিছু নিয়ে নিয়ে তোর কাছে শিখেছি অনেক। কেবল তোর ক্রুয়েলটিটা শিখতে পারছি না। তুই এ মেয়েটাকে ভাল না বেসে পারিস কী করে?

টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে আকাশে তাকিয়ে থাকে বীরু। প্যান্টের পকেটে দুই হাত। একটুক্ষণ স্থির থাকে।

—আমি খুব নিষ্ঠুর ?

—মনে হয়।

—ইদানীং আমি খুব নেশা করছি। গাঁজা, আফিং, এল-এস-ডি, কিছু বাকি নেই। কিছু হয় না তাতে।

—কেন করছিস ?

—টু ফরগেট সামথিং।

--কী ?

—তুমি আমাকে নিষ্ঠুর বলছো ? কেন ? তুমি আমার কতটুকু জানো ?

—কিছুই না। থাক, আমার মনে হচ্ছে দিনে দিনে তুই আমার আরো অচেনা হয়ে যাচ্ছিস। এখনই তোকে আমার পৃথিবীর মানুষ বলে মনে হচ্ছে না, যেন বা তুই অন্য গ্রহের লোক। আমি তোর মতো হার্টলেস্ হতে চাই। আমাকে শিখিয়ে দে।

বীরু হাসে। যথারীতি কোমল জ্যোৎস্নার লাবণ্য ওর কেঠো মসৃণ গালে এক ফোঁটা মোমের মতো ঝরে পড়ল। বলল—কেন হার্টলেস্ হতে চাও ?

মনোরম বলে—আমরা কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করলে পাগল হতাম। এখনো দ্যাখ, বৌয়ের দুঃখ ভুলতে পারি না। তুই কত মেয়েকে ভুলে যাস, আমি একজনকেই পারি না।

—আমি একটা জিনিস ভুলতে পারছি না।

—কী ?

—যাদবপুর রেল স্টেশনে এক বান্ধবীকে তুলতে গিয়েছিলাম গাড়িতে, ট্রেনের দেরী ছিল, কথা বলছিলাম দু'জনে। ভালবাসার কথা। নকল কথা সব। লাইক কস্‌মেটিকস্। ঘুরতে ঘুরতে স্টেশনের একদিকে শেড্-এর তলায় গেছি, বান্ধবীটি হঠাৎ দু'পা সরে এসে বলল—মাগো, ওটা কী ? দেখলাম, একটা বাচ্চা

ছেলে শুয়ে আছে ভিখিরিদের বিছানায়। এত রোগা যে ভাল করে না নজর করলে দেখাই যায় না। ঠিক কাঁকড়ার দাঁড়ার মত দু'খানা হাত নোংরা কাঁথার স্তূপ থেকে শূন্যে উঠে একটু নড়ছে, অবিকল সেইরকমই দু'খানা পা। এত নির্জীব যে খুব ধীরে ধীরে একটু একটু নড়ে, আবার কাঁথায় লুকোয়। তার গায়ের চামড়া আশি-নব্বুই বছরের বুড়োর মতো কোঁচকানো, তুলতুল করছে। হিউম্যান ফর্ম, কিন্তু কী করে বেঁচে আছে বোঝা মুশকিল। চমকে যাই যখন দেখি, তার ঊরুর ফাঁকে রয়েছে পিউবিক হেয়ার, পুরুষাঙ্গ। বাচ্চা ছেলের তো পিউবিক হেয়ার থাকার কথা নয়। একটা উলোঝুলো বুড়ী বসে উকুন মারছিল, সে নিজে থেকেই ডেকে বলল—ষোল বছর বয়স বাবু, রোগে ভুগে ঐ দশা। ছেলেবেলা থেকেই বাড়ন নেই। কিছুই না ব্যাপারটা, কিন্তু সেই থেকে ভুলতে পারি না।

—কেন বীরু ?

—কী জানি! কলকাতায় ভিখিরি-টিকিরি তো কত দেখেছি! কত কুষ্ঠে, আধমড়া, ডিফর্মড। কিন্তু এটা কিছুতেই ভুলতে পারি না। হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে, চমকে উঠি। পিউবিক হেয়ার সমেত একটা বাচ্চা তার কাঁকড়ার মতো হাত পা নাড়ছে। ভীষণ ভয় করে। যত দিন যাচ্ছে, তত সেঁটে বসে যাচ্ছে ছবিটা মনের মধ্যে। কী যে করি!

মনোরম কী বলবে! চুপ করে থাকে।

বীরু মহাকাশচারীর মতোই চাঁদের মাটিতে হাঁটে। ভ্রূ কুঁচকে বলে—বুদ্ধদেব যেন কী কী দেখেছিল ? বার্ধক্য, রোগ, মৃত্যু আর সন্ন্যাস, না ?

—বোধহয়।

—পিউবিক হেয়ার সমেত বাচ্চা ছেলের ফর্ম দেখলে বুদ্ধদেব কী করত বলো তো ?

—কী জানি!

—পাগল হয়ে যেত। কিন্তু আমি কী করি? কী করি বলো তো!

—কী করবি?

—ভাবছি। আস্তে আস্তে অপ্রাকৃত চাঁদের আলোয় ঘুরে বেড়ায় সাদা দীর্ঘ অবয়ব। আস্তে করে বলে—নিষ্ঠুর নই, বুঝেছো? বাড়ি যাও।

—কেন?

—আমি একটু একা থাকি।

পকেটে হাত, চিন্তিত মুখটা নোয়ানো, বীরু আস্তে আস্তে কুয়াশার শরীর নিয়ে ঘোরে। গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার সময়ে দূর থেকে দৃশ্যটা অস্পষ্ট দেখে মনোরম।

॥ ছয় ॥

অনেক অসুখে ভুগে উঠল সীতা। টাইফয়েড হয়েছিল, তার সঙ্গে স্নায়বিক রোগ, জ্বর সেরে যাওয়ার পরও বিছানা ছেড়ে উঠতে পারত না।

আজকাল বারান্দা পর্যন্ত যেতে পারে সে। গায়ে একটা পশমী চাদর জড়িয়ে রেলিং ধরে বসে থাকে চেয়ারে। কান-দুটো ঝাঁঝাঁ করে দুর্বলতায়। হাতে পায়ে শীত। সারা গায়ে খড়ি উঠছে। শরীরের সমস্ত রক্ত কে যেন সিরিঞ্জ দিয়ে টেনে নিয়ে গেছে। এত সাদা দেখায় তাকে। কাগজের মতো পাতলা হয়ে গেছে সে। যেন ওজন নেই।

বিয়েটা পিছিয়ে গেছে। আদ্রায় জয়েন করেছে মানস। কোয়র্টার পেয়েছে। মাঝে মাঝে আসে। পাতিয়ালার কোচিং-এ সে যাচ্ছে না। যেতে ভয় পায়।

বলে—আমি চোখের আড়াল হলেই না জানি তুমি কী ঘটিয়ে বসবে!

—কী ঘটাবো?

—কী জানি! ভয় করে। তোমাকে অসুখের সময়ে দেখে মনে হতো পুটুস করে মরে যাবে বুঝি! সাদা হাতে নীল শিরা দেখা যাচ্ছে, চোখে কালি, শ্বাস ফেলছো না-ফেলার মতো। কী যে আপসেট করে দাও।

এক এক সময়ে আদ্রার কথা ভাবতে ভালই লাগে সীতার। সেখানে বোধহয় নির্জনতা আছে। বনভূমি, একটা কলস্বরা নদী। কলকাতার মতো সেটা দোকানের শহর নয়। না হোক। তবু সেখানে ভূতুড়ে টেলিফোন যাবে না!

আবার মনে হয়, কলকাতা ছেড়ে যাবে? সারা দুপুর ঘুরে ঘুরে জিনিস কেনা, সে যে কী ভাল! কাজের জিনিস, অকাজের জিনিস, ঠকে আসবে, তারপর দাঁতে ঠোঁট কামড়াবে, আবার পরদিন বেরোবে ঠকতে, কণ্টকিত শরীরে মাঝে মাঝে শুনবে সেই গোস্ট কল্। গোস্ট? হবেও বা।

সেরে উঠছে সীতা, আজকাল এ সব রোগ সহজেই সারে।

একটা ম্যাক্সি কিনেছিল সীতা শখ করে, বহুদিন আগে। সুটকেশ ঘাঁটতে গিয়ে টেনে বের করল। ফুল ভয়েলের ওপর পিঙ্ক লাল আর কালো চমৎকার নক্শা, হাতে সূক্ষ্ম লেসের ফ্রিল। ম্যাক্সি পরার কথা তার নয়। পরবার জন্য বা ব্যবহার করার জন্য নয়, শখ করে কত অকাজের জিনিসই সে যে কেনে!

ম্যাক্সিটা বুকে করে সে আয়নার সামনে এল। খুব রোগা হয়ে গেছে সে। সাদা। কিন্তু তার মুখে অসুখের ফলে কোনো বুড়োটে ছাপ পড়েনি। বরং যেন বা বয়স কমে গেছে তার। বালিকার মতো দেখাচ্ছে।

দরজা বন্ধ করে আসে সীতা। শাড়ি ছেড়ে ম্যাক্সিটা পরে নেয়। পায়ের পাতা পযন্ত ঝুল। শরীরটা একটু আঁট বুঝি। ঘুরেফিরে আয়নায় দেখে সে নিজেকে। ওমা, সে তো আর যুবতী নেই। একদম না। ঠিক সেই কিশোরী সীতা। পাতলা, ফর্সা, ছোট্টটি। বুকটা দেখে হেসে ফেলে সে। স্তনভার নেই। বোঝাই যায় না বুকে কিছু আছে। শুধু দু'ধারে কুঁচির ওপর একটু একটু ঢেউ। ঠিক প্রথম যেমন হয়। আস্তে আস্তে পা ফেলে আয়না থেকে দূরে গেল সীতা। দেখল। কাছে এল। দেখল। কোনো ভুল নেই। সেইরকম অবিকল, যেমন সে ছিল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে টুলে ভাবতে বসল সীতা। পশ্চাৎগামী রেলগাড়ির মতো সে ফিরে যাচ্ছিল সেই বয়সে।

নানা বয়সের স্মৃতি চলন্ত রেলগাড়ি থেকে আলোর চৌখুপী ফেলে যাচ্ছে।

একদিন দুপুরে টেলিফোন এল।

—মিসেস লাহিড়ী আছেন?

—লাহিড়ী! না তো! লাহিড়ী কেউ নেই। রং নাম্বার।

সীতা ফোন নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল।

ওপাশে কণ্ঠস্বরটা আতকে উঠে বলে - না, না, রং নাম্বার নয়! আপনি কে বলুন!

—আমি! অবাক হয়ে সীতা বলে—আমি সীতা ব্যানার্জি!

—ব্যানার্জি? কণ্ঠস্বরটা যেন বিষম খায়, বলে—মৌ, তুমি এখনো ব্যানার্জি?

—ওঃ। বলে ভয় পেয়ে চুপ করে যায় সীতা।

—কী?

—ভুল হয়েছিল।

অধৈর্যের গলায় মানস বলে—মৌ, ডিসগাষ্টিং।

—ভুল তো মানুষ করেই। আমি ভাবলাম বোধহয় এজেন্সির ব্যাপারে কেউ কিছু জানতে চাইছে। এজেন্সিটা তো ঐ নামেই।

—ঠিক আছে। ক্ষমা করলাম।

—কখন এসেছো কলকাতায়?

—সকালে। কিন্তু এবার দেখা হচ্ছে না, এক্ষুনি বার্নপুরে যাচ্ছি। ফোন করছি হাওড়া থেকে। অল-ইণ্ডিয়া মিট, ভীষণ ব্যস্ত। কেমন আছো?

—ভাল।

—আমাকে ছেড়েও ভাল?

—না, না, তা বলিনি। এমনি ভালই।

—ভাল থাকো, ছেড়ে দিচ্ছি।

ম্যাক্সিটা মাঝে মাঝে বের করে পরে সীতা। বালিকা সেজে বসে থাকে। দুটো বিনুনী ঝুলিয়ে দেয়। আয়নায় তাকিয়ে হাসে। একটা পশ্চাৎগামী রেলগাড়ি তাকে তখন তুলে নিয়ে যায়, আলোর চৌখুপীগুলি নানা রঙ ফেলে যেতে থাকে।

সীতা আস্তে আস্তে আবার রাস্তায় বেরোয়, একা একা চলে যায় গড়িয়াহাটা, এসপ্ল্যানেড, নিউমার্কেট, হাতিবাগান। ঘুরে ঘুরে কেনে কাজের জিনিস, অকাজের জিনিস। ভাল লাগে। বড় ভাল লাগে।

মাঝে মাঝে একটা চমকা ভয় বুক খামচে ধরে। চলে যেতে হবে কলকাতা ছেড়ে? সে কলকাতার বাইবে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না যেন। কলকাতার বাইরে গিয়ে তার কখনো ভাল লাগেনি। একবার লেগেছিল। শিমুলতলায়।

॥ সাত ॥

আজকাল ঘুমের মধ্যেও মনোরম একটা আর্ত চীৎকার শুনতে পায় —ফলো হিম্, ঝুমু, ওযাচ হিম।

অস্ফুট যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে মনোরম পাশ ফেরে। নিরুদ্ধ গলায় ঘুমের মধ্যেই বলে—আমি কি পারি মামা? ওর সঙ্গে আমি কি পারি?

—ও যে মরবে ঝুমু! ও যে শীগ্‌গির মরবে! একদিন ওর ডেডবডি ধরাধরি করে নিয়ে আসবে রাস্তার লোক।

মরে যদি কে ঠেকাবে?

—তুই ঠেকাবি ঝুমু। ফলো হিম।

—আমার যৌবন বয়স শেষ হয়ে গেছে মামা। অত স্পীড আমি কোথায় পাবো? আমি তত বড় নই যে ওকে ঢেকে রাখব, বা ওকে আড়াল করব।

—দয়া কর ঝুমু, তুই পারবি। তোর মতো ওকে কেউ বোঝে না। আমিও না।

—কী বুঝেছি মামা? কখনো মনে হয় ও চাঁদের মাটির ওপর হাঁটছে, ঠিক যেমন নীল আর্মস্ট্রং হেঁটেছিল চাঁদে। কখনো মনে হয়, ও এক অন্য গ্রহ থেকে আসা মানুষ, জ্যোৎস্নামাখা হলুদ কুয়াশায় হঠাৎ মিলিয়ে যাবে। মামা, বাঁরু কি রিয়্যাল?

—কী বলছিস ঝুমু? রিয়্যাল নয়?

—বাঁরু নামে সত্যিই কেউ আছে?

—নেই! কী বলিস তুই! বাঁরু নেই?

—আছে হয়তো। অন্য পৃথিবীতে।

—তুই কি পাগল? অন্য পৃথিবী আবার কী?

—জানো তো টেলিফোনের একটা তার-এ হাজার ফ্রিকোয়েন্সি-তে হাজার মানুষের কথা ভেসে চলে! ধরো, একটাই তার, তাতে আমি কথা বলছি বিশ্বাসের সঙ্গে, তুমি সেই মাদ্রাজী ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে। বিশ্বাসের কথা তুমি শুনতে পাচ্ছো না, আমিও শুনতে পাচ্ছি না সেই মাদ্রাজী ইঞ্জিনীয়ারের কথা। ঠিক তেমনি, এই আমরা যেখানে বাস করি, সেই পৃথিবীতেই বসবাস করে বীরু। কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি আলাদা, পৃথিবী আলাদা।

—তোর বড্ড হেঁয়ালি কথা! তবু যদি সত্যি হয়, ঝুমু, আমি তোর মাইনে বাড়িয়ে দেবো, তোকে ম্যানেজার করব, তুই বীরুর ফ্রিকোয়েন্সিতে ঢুকে পড়।

—চেষ্টা করছি মামা, পারছি না। বয়স হয়ে গেছে, তাছাড়া আমারও কি দুঃখ-টুঃখ কিছু থাকতে নেই মামা? দেখ, নড়ন্ত জিভ, একটা অ্যাকসিডেন্টের স্মৃতি, সীতা, স্বপ্নের মেয়েরা, ইডিও-মোটর অ্যাকশন—সব মিলিয়ে একটা জাল, এই জাল ছিঁড়ে সহজে কি বেরোনো যায়! চেষ্টা করছি।

—কর। তুই যা চাস তোকে আমি সব দেবো।

—জানি মামা।

—কী জানিস?

—বীরুর জন্যই তুমি আমাকে ভালবাসো। কিন্তু এখন আমার ঘুমের সময়, তুমি আর স্বপ্নের মধ্যে আমাকে ডেকো না। আমি ঘুমোবো, আমি উল্টে রেখেছি বই, নিবিয়ে দিয়েছি বাতি। অন্ধকারে আমার শরীরের ভিতরে এক্ষুনি জ্বলে উঠবে নীল লাল স্বপ্নের আলোগুলি। ঐ তো মোড়ের তে-মাথা পেরিয়ে হেঁটে আসছে আমার ঘুম, অবিকল মানুষের মতো, হাঁসের মতো গায়ের অন্ধকার কণাগুলি ঝেড়ে ফেলে সে আসবে কাছে। সম্মোহনের দীর্ঘ আঙুলগুলি নড়বে চোখের সামনে। তোমরা যাও …আমি ঘুমিয়ে পড়ব…

একটু স্যাঁতসেঁতে বিছানাটা। ফাঁকা। মনোরমের হাত এলিয়ে

পড়ে থাকে। সেই হাত কিছুই স্পর্শ করে না।

ঠিক দুপুরবেলায় চোখের রোদ-চশমাটা খুলে মনোরম এসপ্ল্যানেডের ট্রামগুমটির টেলিফোন বুথ্-এ ঢুকে গেল। ডায়াল করল, পয়সা ফেলল।

—হ্যালো। একটা চাপা সতর্ক গলা ভেসে আসে।

—দিস ইজ জেমস্ বণ্ড।

—কে ?

- জিরো জিরো সেভেন।

—গুডনেস। ব্যানার্জি ?

—ইয়াঃ।

—বিসোয়াস হিয়ার। আমাকে আর কতকাল অপেক্ষা করতে হবে ব্যানার্জি ? মানুষের আয়ুর তো শেষ আছে।

ফিস ফিস করে একটা ভৌতিক গলায় কথা বলে বিশ্বাস।

—জানি বিশ্বাস। আমি একটা ট্রাফিক জ্যাম্-এ পড়ে গেছি। সামনে একটা ফিয়াট গাড়ি, সেটাকে পেরোতে পারছি না। সেটাকে পেরোতে পারলেই আপনার কাছে পৌঁছে যাবো। আর কয়েকটা দিন।

—ফিয়াট গাড়ি ? কী বলছেন ব্যানার্জি ? কার গাড়ি ?

—সেই ছেলেটার পিছু-নেওয়া এখনো শেষ হয়নি বিশ্বাস।

—এখনো তাকে চেজ করছেন ?

—এখনো।

—সে মরেনি তাহলে ?

—না।

—তবে বোধহয় সে আরো কিছুকাল বেঁচে থাকবে, কিন্তু আমি বোধহয় বাঁচব না ব্যানার্জি।

—কেন ?

—আমার গলাটা কেমন বসে গেছে, লক্ষ্য করেছেন ?

—হু ।

—ক্যানসার।

—যাঃ।

—বায়োপ্‌সি করিয়েছি। মাসখানেকের মধ্যেই হাসপাতালে বেড নেবো।

মনোরম চুপ করে থাকে।

- ব্যানার্জি !

—উঁ ।

—সময় নেই। একদম না। আমার বাচ্চারা মাইনর, বউটা বুদ্ধি রাখে না। এত সব কে দেখবে ? আপনাকে ছাড়া আমার চলবে না। আপনি কথা দিয়েছিলেন।

মনোরম একটা শ্বাস ছাড়ল।

—শুনছেন ব্যানার্জি ?

—শুনছি।

—নতুন বিজনেস ওপেন করব ভাবছিলাম। ড্রাগস, নারকোটিকস। ম্যারিজুয়ানা থেকে হাশীশ পর্যন্ত। খুব বাজার এখন। কিন্তু কী করে করব ?

—দেখছি বিশ্বাস। আর কয়েকটা দিন।

—আপনাকে চাই-ই। ঠাট্টা নয় ব্যানার্জি, আপনি সত্যিকারের জিরো জিরো সেভেন হতে পারবেন। আমি একজন রিয়্যাল জিরো জিরো সেভেন চাই। হাত মেলান ভাই।

মনোরম হাসল।

—হাসবেন না। হাতটা বাড়ান...বাড়িয়েছেন ?

মনোরম শূন্যে তার হাতটা সত্যিই বাড়িয়ে দিয়ে বলল—বাড়িয়েছি।

—আমিও বাড়িয়েছি...এইবার ধরুন হাতটা...মুঠো করুন।

—করেছি।

শূন্যেই হাত মুঠো করে মনোরম, শেকহ্যাণ্ডের ভঙ্গীতে।

—দ্যাটস দ্য বণ্ড। আমরা কিন্তু হাত মিলিয়েছি ব্যানার্জি

—ইয়াঃ।

টেলিফোনটা হুক-এ ঝুলিয়ে রাখে মনোরম।

এ বছর কলকাতায় খুব শীত পড়ে গেল। উত্তুরে হু-হু হাওয়া দেয়। ময়দানের গাছগুলো থেকে পাতা খসে খসে পড়ে গেল সব। দেহাতীরা সেই পাতা কুড়িয়ে আগুন জ্বালে, হাত-পা সেঁকে নেয়। বেকার আর ভবঘুরেরা পার্কে পার্কে বেঞ্চে আর ঘাসে শুয়ে কবোষ্ণ রোদে ঘুমোয় সারা বেলা। এসপ্ল্যানেডের চাতালে তিব্বতী কিংবা ভুটিয়া মেয়েরা সস্তায় সোয়েটার বিক্রী করছে। তাদের ঘিরে এ বছর ভিড় বেড়েছে। শহরতলীর দিকে আপ লোকাল ট্রেনগুলো ছুটির দিনে বোঝাই হয়ে যায়। শীতের পিকনিকে যাচ্ছে কলকাতার মানুষ। চিড়িয়াখানায় ভিড়, সিনেমা হল-এ লাইন। শীতের রোদ মাখবার জন্য বাইরে বেরিয়ে পড়ে লোকজন।

একটা তিব্বতী মেয়ের কাছ থেকে তার হলদে দাঁতের হাসি সমেত একটা পুলওভার কিনল মনোরম। সাদা। বুকে আর পেটে পাশাপাশি চারটে চারটে আটটা সবুজ বরফি। পুলওভারটা পরে বেরোলে যে-কেউ মনোরমকে দু'বার ফিরে দেখে।

'বাটা' বিজ্ঞাপন দিচ্ছে—'শীতকালেই তো সাজগোজ'। মনোরমও তাই ভাবে। এই শীতে সে একটু সাজবে। একজোড়া চমৎকার জুতো কিনে ফেলল সে। ক্রোকোডাইল প্যাটার্নের চামড়া। হাঁটুতে পকেটওলা একটা মার্কিনী কায়দার প্যান্ট করল, যার সেলাইগুলো দূর থেকে দেখা যায়। মামা টাকা দিচ্ছে। দেওয়ার হাত একটু একটু করে আসছে মামার।

পুরোনো বন্ধুদের এক-আধজনের সঙ্গে দেখা হলে তারা জিজ্ঞেস করে—কী ব্যাপার ? চিনতেই পারা যায় না যে !

মনোরম উত্তর দেয়—জেমস্ বণ্ড হয়ে গেছি ভাই, কমপ্লিট জিরো জিরো সেভেন।

—কাজ-কারবার ?

—নতুন ব্যবসা খুলছি ভাই ! কর ফাঁকি দিতে চাও, কি নতুন ধরনের নেশা করতে চাও, যা চাও কণ্ট্যাক্ট বিসোয়াস অ্যাণ্ড ব্যানার্জি। শীগ্‌গিরই স্টার্ট করব।

কিন্তু ঝোলাচ্ছে বীরুটা। আর মামা। বিশ্বাসকে কথা দেওয়া আছে। কিন্তু মামা ছাড়ে না কিছুতেই। প্রতি মাসে টাকা বাড়াচ্ছে আজকাল। বলে—আর কটা দিন একটু ছাখ।

এই শীতে বীরু নতুন পোশাক তেমন কিছু করল না। শীতের শুরুতে মাসখানেকের জন্য হিল্লী-দিল্লী কোথায় কোথায় ঘুরে এল। ততদিন মামা দিনরাত তাকে কাঠের তত্ত্ব বোঝাতো। মনোরমের জন্য নয়। মামার ধারণা, মনোরম শিখে বীরুকে শেখাবে। যদি বীরু না-ই শেখে কোনোদিন, তবে মনোরম ম্যানেজার হয়ে চালিয়ে নেবে কারবার। বীরুর যেন কষ্ট না হয়।

তিন দিকে ঘেরা জালের মধ্যে বীরু দাঁড়িয়ে আছে। একটা দিক খোলা। সেই খোলা দিক দিয়ে ছুটে আসে রক্তাক্ত বল। বীরুর হাতে ব্যাটটা চমকায়। কিন্তু বলের লাইনটা ধরতে পারে না, স্টাম্প ভেঙে জালে লাফিয়ে পড়ে বল। পরের পর এরকম হতে থাকে। বীরু বলের লাইন দেখতে পাচ্ছে না। যে-ছেলেটা বল করছে সে নতুন, স্কুল ক্রিকেটার। বল তেমন কিছু ভাল করে না। তবু বারবারই বীরু বল খেলতে পারল না। নেট প্র্যাকটিসের

বাঁধা সময় পার হয়ে গেলে সে বেরিয়ে এল।

মনোরম বশংবদ দাঁড়িয়ে আছে মাঠের ধারে। বীরুর ওপর সতর্ক চোখ।

বীরু তাকে দেখে একটু হাসল। তারপর গেটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল—বাবার চাকরিটা করে যাচ্ছো তা হলে এখনো?

—করছি।

—করো। কিন্তু কিছু জানার নেই। আমিই জানি না।

—এখনও ভুলতে পারছিস না বীরু?

—কী?

—সেই স্টেশনে যেটা দেখেছিলি।

বীরু একটা শ্বাস ছেড়ে মাথা নাড়ল—না।

—কেন?

—গেঁথে গেছে। অটো সাজেশানের মতো। মানুষের অনেক সময় হয়, খেতে বসলে সবচেয়ে ঘেন্নার কথা মনে পড়ে, একা ঘরে মনে পড়ে ভূতের গল্প। অনেকটা সে রকমই। যত ভুলতে চাই, তত মনে পড়ে।

—কী করবি?

—ভাবছি।

—তুই একটুও ভাবছিস না।

—ভাবছি। তুমি অস্থির হয়ো না। চাকরিটা করে যাও।

—বীরু, মামার বড় ভয়, তুই সুইসাইড্ ফাইড্ করবি না তো কখনো?

—সুইসাইড্! বীরু একটু থমকে দাঁড়ায়। হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ খেলে যায় ওর চোখে, বলে—ভাবিনি তো কখনো!

মনোরম ভীষণ হতাশ হয়ে বলে—ভাবিসনি! তবে কি আমিই তোকে মনে করিয়ে দিলাম?

—দিলে। সুইসাইডের কথা ভাবতে বোধহয় মন্দ লাগে

না কখনো কখনো ! মাঝে মাঝে ভাববো।

—কেন ভাববি বীরু ? ভাবিস না। আমি কথাটা উইথড্র করে নিচ্ছি।

—ভয় পেও না। সুইসাইডের চিন্তা কখনো করিনি। চিন্তাটা করতে বোধহয় ভালই লাগবে।

—যদি ওটাও অটো সাজেশানে দাঁড়িয়ে যায় ?

বীরু ধীর পায়ে তার ফিয়াটের দিকে হেঁটে চলে গেল। আর ফিরে তাকাল না।

ক'দিনের মধ্যেই বীরু ছেঁটে ফেলল লম্বা চুল, জুলফি। শুধু ছোটো একটি গোঁফ রেখে দিল। এই শীতে একটা আধ-ময়লা পাঞ্জাবি আর পাজামা পরতে লাগল। ফিয়াটটা গ্যারেজেই পড়ে থাকে। বীরু হাঁটে। এ রাস্তা থেকে ও রাস্তা। গলি ঘুঁজিতে চলে যায়। দিশি গাড়িটা নিয়ে বড্ড বিপদে পড়ে গেল মনোরম। এখন আর গাড়িতে বীরুকে অনুসরণ করার মানেই হয় না। সব গলিতে গাড়ি ঢোকে না, তা ছাড়া মানুষের হাঁটার গতির সমান ধীর গতিতে গাড়ি চালানো যায় না সব সময়ে। অতএব গাড়ি ছেড়ে হাঁটা ধরে মনোরম। এবং প্রথম ধাক্কাতেই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এত সব হাঁটার অভ্যাস ছিল না তার। তার ওপর লম্বা পায়ে বীরু জোরে হেঁটে যায়, তাল রাখতে গিয়ে দমসম হয়ে পড়ে সে। তবু তীব্র এক আকর্ষণে সে ঠিকই চলে। পিছু তাকায় না। বীরু টের পায়। মাঝে মাঝে পিছু ফিরে ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। কখনো হাসে একটু ম্লান হাসি। কখনো চাপা গলায় বলে বাক্ আপ্।

বুধবার রাতে বীরুকে তার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে যেতে দেখেছে মনোরম। তারপর ফিরে গেছে পূর্ণদাস রোডের ফ্ল্যাটে। পরদিন সকালে আবার এসেছে অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। দাঁড়িয়ে থেকেছে। সারাদিন বীরু নামল না। দারোয়ানের কাছে খোঁজ নিল মনোরম। না সাহেব নামেনি। অনেক রাত পর্যন্ত ঠায়

দাঁড়িয়ে রইল সে। বীরু নামল না। পরদিনও না।

তৃতীয় দিন মনোরমের বুক কাঁপছিল। দারোয়ান মাথা নেড়ে বলল—কিছু জানি না। এত বড় ফ্ল্যাট বাড়ি, কে কখন আসে যায়!

সন্ধ্যেবেলায় চাঁদ ওঠে। মনোরম গেট গেল পার্ক পর্যন্ত। কুয়াশা আছে। হলুদ জোৎস্না। দু-চারজন লোক আছে পার্কে, সঙ্গে কারো কারো প্রেমিকা বা ভাড়াটে মেয়েছেলে। মনোরম পার্কটার একটা কোণে দাঁড়িয়ে অ্যাপার্টমেন্টের দিকে চেয়ে রইল। বীরুর ঘরে যথারীতি অন্ধকার। তিন দিন ধরে আলো জ্বলছে না ওর ঘরে। মনোরম যখন সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করল তখন দেখে তার হাত থরথর করে কাঁপছে। পেট ডাকছে কলকল করে। উদ্বেগে সে অনেকক্ষণ কিছু খাওয়ার কথা মনে করেনি।

অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করল মনোরম। পার্ক ক্রমে নির্জন হয়ে গেল। সে একা। হিম পড়ে তার গা ভিজছে, মাথা ভিজছে। হাওয়া চোখে জল আসে। গলায় ব্যথা, একটু একটু কাশি। হাতে পায়ে খিল ধরা ভাব। ঝিঁঝিঁ লেগেছে। এ কয় মাসে বীরুকে সে ভালবেসে ফেলেছিল, তা আজ বুঝতে পারল। ওই অ্যাপার্টমেন্টে কী হয়েছে তা এত রাতে জানতে যেতে সাহস হল না তার। কোথেকে একটা রাতচরা পুলিস খেটে লাঠি দোলাতে দোলাতে কাছে এসে বলল—কেয়া?

মনোরম মাথা নেড়ে বলে—কুছ নহী।

—তব্‌?

মনোরম হাঁটতে থাকে। পার্কের রেলিং ডিঙিয়ে রাস্তায় পড়ে। ফিরে আসে পূর্ণ দাস রোডের ফ্ল্যাটে। ঘুমোতে পারে না। স্বপ্ন দেখে না। তার কোনো ইডিও-মোটর অ্যাকশনও হয় না আজ। রোজ কয়েকবার যে কথাটা তার মনে পড়ে সেই ট্রেন দুর্ঘটনাও মনে পড়ে না। ঘরের বাতি নিবিয়ে সে বসে থাকে জানালার পাশে। সিগারেট খায়। তার নিঃসঙ্গতায় কেবলমাত্র সঙ্গ দেয় নড়ন্ত

জিভটা। টুক টুক করে নড়ছে। নড়ছেই। সে বড় মর্মান্তিক-ভাবে বুঝতে পারে, বীরুকে সে বড্ড ভালবেসে ফেলেছিল। বড্ড বেশী। বোধ হয় আর কিছু করার নেই।

খুব ভোরবেলা সে আর একবার অ্যাপার্টমেণ্টের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। কুয়াশায় গাঢ় আকাশে বহু দূর উঠে গেছে বাড়িটা। অন্ধকার জানালা সব। কোলাপসিবল্ গেট বন্ধ। বীরুর জানালায় আলো নেই।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আবার হাঁটতে থাকে। শীতটা কি খুবই পড়ল এবার? হাত পা সিঁটিয়ে যাচ্ছে। ভোর-আলোয় দুটো হাত চোখের সামনে তুলে ধরে দেখে সে। হাত দুটো রক্তহীন, সাদা, আঙুলের ডগায় চামড়া কুঁচকে আছে, অনেকক্ষণ জলে ভিজলে যেমন হয়। শরীরে একটা কাঁপুনি। শীতের জন্যই? নাকি অন্তর্নিহিত গূঢ় শোক থেকে উঠে আসছে শরীর জুড়ে এক নিস্তব্ধ ক্রন্দন? নাকি ভয়? অনিশ্চয়তা? হাঁটে, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নয়। খানিকটা উদ্‌ভ্রান্তের মতো।

তবু ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে সে হাজির হয় কাঠগোলায়। বীরুর ফিয়াটটা বাইরে দাঁড়ানো। আপাদমস্তক শিউরে ওঠে মনোরম।

মামা বাইরের চালায় বসে আছে। কী গভীর হয়ে চোখের কোলে কালি পড়েছে! ঘুমহীন জ্বালাভরা চোখ। কষ্টে শ্বাস টানছে।

—তিন দিন তুই দেখাই দিসনি ঝুমু। বীরুর খবর কী?

—একই খবর। বীরুর গাড়িটা দেখছি—সতর্ক গলায় বলে মনোরম।

গভীর ক্লান্তিতে মামা বলে—আমিই এনেছি ওটা। গ্যারেজে পড়ে আছে, মাঝে মাঝে চালু না করলে ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যাবে। ওর ঘরে গাড়ির চাবিটা পড়ে ছিল। ভাবলাম নিয়ে বেরোই। কখন হুট্ করে এসে হাজির হবে, তখন গাড়ি রেডি না পেলেই তো মাথা গরম হবে। তাই ইঞ্জিনটা চালু রাখছি।

—ও।

—কী করছে এখন হারামজাদা ?

—মামা, এবার আমাকে ছেড়ে দাও। বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমার সেই বন্ধুর গলায় হঠাৎ ক্যান্সার ধরা পড়েছে। বেশী দিন নেই।

—যাবি ? বলে যেন হাতের ভর স্খলিত হয়ে যায় মামার। রোগা লম্বা শরীরটা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে।

—ঝুমু! মামা হাঁফানির শ্বাস টেনে বলে।

—বলো মামা। মনোরম মামার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলে—কী হয়েছে তোমার ?

—শোন্, ও যখনই ফিরুক, যবেই ফিরুক, ওর সব সাজানো রইল। ওর ঘর সাজানো আছে, ব্যবসাপত্র সব গুছিয়ে রাখা আছে, ওর গাড়ির ইঞ্জিন আমি চালু রাখছি। ওকে বলিস, আমার যা সাধ্য সব করে রেখেছি ওর জন্য।

—বীরু তো সবই জানে মামা।

—ভূপতিকে সব বুঝিয়ে গেলাম, তুইও দেখিস।

—তোমার কী হয়েছে ?

—ঝুমু, প্রদীপ নিবে গেলে একটা তেলপোড়া গন্ধ পাওয়া যায় জানিস তো ?

—হ্যাঁ, বিচ্ছিরি গন্ধ।

—সেই গন্ধটা মানুষ যখন আর পায় না, তখনই বুঝতে হবে তার আর মরার দেরি নেই।

—তার মানে ?

—ও একটা তুক্। মানুষ মরার আগে নেবানো প্রদীপের সামনে বসেও সেই গন্ধটা পায় না। আমি গতকাল সন্ধ্যের সময়ে পুজোর পর প্রদীপটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে অনেকক্ষণ বসে গন্ধটা পাওয়ার চেষ্টা করলাম। পেলাম না। ঝুমু, আমারও আর দেরি নেই।

—এ সব কথার কোনো মানে হয় না মামা।

—তুই যেন কার সঙ্গে ব্যবসাতে নাবছিস ?

—বন্ধু।

—যাবিই ঝুমু ?

—কথা দিয়েছি।

—তা হলে যা। ফাঁকে ফাঁকে এসে একটু বাকুবে দেখে যাস। তোর মামীকেও।

—দেখব মামা।

মনোরম কাঠগোলা থেকে বেরিয়ে আসে। মামা এখনো কিছুদিন টের পাবে না। বারু তো এরকম কতদিন ডুব দিয়ে থেকেছে। সে-রকমই কিছু ভেবে নিশ্চিন্ত থাকবে। মনোরম একটা সত্যিকারের দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

সামনেই গোল পার্কের ওপর শীতের প্রকাণ্ড আকাশ রোদভরা হয়ে ঝুঁকে আছে। হঠাৎ কলকাতা মুছে যায়। আবছা স্মৃতির কুয়াশা ভেদ করে মনোরম দেখতে পায় ঘাটের পৈঠার মতো দীর্ঘ সব সিঁড়ি। ইস্কুলবাড়ির তিনশো ছেলে সেই সিঁড়িতে সারি সারি দাঁড়িয়ে জোড়হাতে গাইছে—জয় জগদীশ হরে·· ···

বহু দিনের পুরনো সেই আকাশ অতীত থেকে হঠাৎ আজ ঝুঁকে পড়ে মনোরমের চোখের ওপর। হাতের উল্টো পিঠে সে চোখের জল মুছে নেয়।

কলকাতায় এবার কি খুব শীত পড়েছে! এত রোদ্দুরে হাঁটে মনোরম, তবুও শরীর তার কেঁপে ওঠে। হাত দুটো সামনে সিঁটানো। হাঁটে, কেবলই হাঁটে মনোরম। শীত যায় না গাড়ির শব্দ হয় চারপাশে, মানুষের পদশব্দ থেকে যায় পথে। মনোরম আর কারো পিছু নেয় না কখনো। রাতে সে তার ঠাণ্ডা বিছানায় এসে শোয়। একটু ওম্-এর জন্য বড় খুঁতখুঁত করে তার

শরীর। চোখ বুজতে না বুজতেই ফুলের পাপড়ির মতো স্বপ্নরা ঝরে পড়ে চোখে। মনে পড়ে সেই দুর্ঘটনা। চমকে উঠে বসে সে। ইডিও-মোটর অ্যাকশন হতে থাকে।

টেলিফোনে একদিন বিশ্বাসের নম্বর ডায়াল করল মনোরম অবশেষে।

গমগমে একটা গলা উত্তর দিল—হ্যালিও ....

মনোরম ভাবে, তবে কি ক্যানসার সেরে গেছে বিশ্বাসের। আবার সেই রোগমুক্ত প্রকাণ্ড চেহারাটা লু-বাতাসের মতো মুখের ওপর শ্বাস ফেলে বলবে—ব্যানার্জি, বিসোয়াস হিয়ার।

—হ্যালিও...

মনোরম জিজ্ঞেস করে—বিশ্বাস?

—উনি তো হাসপাতালে আছেন।

—ও।

—কিছু বলার ছিল?

—না। ঠিক আছে।

বাড়িভাড়া আবার বাকি পড়ে। জমে উঠছে ঋণ। মনোরম হাঁটে। ওপেনিং খোঁজে। পায় না। বয়স হয়ে যাচ্ছে ক্রমে। তবু হাঁটে মনোরম। এ রাস্তা থেকে ও রাস্তা। সেই অ্যাপার্ট-মেন্টের সামনে কখনো যায় না। যায় না মামার কাঠগোলাতেও। বিশ্বাসকে আর কখনো ফোন করেনি মনোরম। থাক, সে কিছুই জানতে চায় না। মনোময় যেদিন মারা যায়, সেদিন সকালে সে প্রতিবেশীর বাসা থেকে ইস্কুলে বেরিয়ে, বাড়ির দিক থেকে কান্নার রোল শুনে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল ইস্কুলে। প্রার্থনার সারিতে দাঁড়িয়ে কেঁদেছিল। আজও পালায়, অবিকল সেই রকম। কল্পনা করে, মামা রোজ এসে কাঠগোলায় বসছে, নিরস্তু প্রদীপের গন্ধ

আবার ফিরে পেয়েছে মামা। বীরু তাকে ফাঁকি দিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বোধহয় পালিয়ে গিয়েছিল মাঝরাতে। তারপর বোধ হয় গিয়েছিল গৌরীর কাছে। ওরা দূরে কোথাও আছে, একসঙ্গে। বিশ্বাস অপারেশনের পর ভাল হয়ে আবার দাবড়াচ্ছে তার পুরনো বিদেশী গাড়ি, মদ খাচ্ছে, ফুর্তি করছে, বেশী রাতে বাড়ি ফিরে খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ছুঁড়ে দিচ্ছে এক পাটি জুতো···

কল্পনায় সবই থাক। সত্যি কী, তা জানতে চায় না মনোরম। এবারের শীতে কলকাতা বড় সুন্দর। এ রকমই সুন্দর থাক সব কিছু। ভাবতে ভাবতে তার ইডিও-মোটর অ্যাকশন হতে থাকে। সে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পায় বিশ্বাসকে, সোঁ করে গাড়িতে বেবিয়ে যেতে যেতে বলে গেল—'বাই···'। গ্র্যাণ্ড হোটেলের উল্টো দিকে পার্কিং লট-এ থেমে থাকা ভোঁতামুখ গাড়ি থেকে মামা যেন ডাক দেয়—ঝুমু! আর কখনো ভিড়ের মধ্যে সামনে লম্বা বীরু হঠাৎ হাঁটতে থাকে। ভ্রূ কুঁচকে পিছু ফিরে চায়, হাসে, কখনো বলে—বাক্ আপ্।

অবিকল এইভাবেই একদিন সীতাকে দেখতে পায় মনোরম। তখন দুপুর। নিউ মার্কেটের ছায়ায় ছায়ায় শীত গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল মনোরম। সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন। গায়ে সাদার ওপর সবুজ বরফিওলা পুলওভার, মার্কিনী ছাঁটের প্যান্ট পরনে, পায়ে ক্রোকোডাইল মোকাসিন। ছায়া, তবু রোদচশমাটাও ছিল চোখে, হঠাৎ দেখে, উল্টোদিক থেকে সীতা হেঁটে হেঁটে আসছে। পুরনো স্বভাব সীতার, দোকানের সাজানো জিনিস দেখছে নীচু হয়ে। এক পা এক পা করে হেঁটে আসে সীতা।

স্বপ্নই। বিভ্রম। এক্ষুনি কল্পনার সীতা মিলিয়ে যাবে। তবু যতক্ষণ তাকে দেখা যায় ততক্ষণ দেখবে বলে চোখে পিপাসা নিয়ে তাকিয়ে থাকে মনোরম। বহু দিন সীতাকে দেখেনি। সেই কতদিন আগে দেখেছিল এসপ্ল্যানেডের চাতালে, মেঘভাঙা রোদে। মহার্ঘ মানুষের মতো মাটি থেকে যেন একটু ওপরে শূন্যে

পায়ের আলপনা ফেলে চলে গিয়েছিল। প্রাকৃতিক আলোগুলি রঙ্গমঞ্চের ফোকাসের মতো এসে পড়েছিল ওর গায়ে। তারপর বহুদিন বাদে আবার কল্পনায় দেখা হল। মনোরম চেয়ে থাকে।

সীতা হেঁটে আসছে। কাল্পনিক। তবু অপেক্ষা করে মনোরম। যদি তাকে না দেখে এরকমই হেটে আসতে থাকে, তবে সোজা এসে মনোরমের বুকে ধাক্কা খাবে। ঠিক যেমন স্থবির গাড়িতে চলন্ত ইঞ্জিন এসে লেগে যায়। সেই বিভ্রম, সেই প্রবল কাল্পনিক সংঘর্ষের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে মনোরম। সীতা অনন্ত পথ পার হয়ে আসছে। একটু একটু করে। বড় একটা দোষ ছিল ওর, যা খুশি কিনে আনত। কলকাতার দোকান ছেয়ে গেছে নকল দু' নম্বর মালে। রোজ ঠকে আসত। বকত মনোরম। ঠিক সেই রকমই বালিকার মতো অপার কৌতূহলভরা চোখে দোকানের সাজানো জিনিস দেখছে আজও। মনোরমকে দেখেনি। সচেতন নয়। মনোরমের বিভ্রমের পথ ধরে আসছে সীতা, কল্পনা, স্বপ্ন।

মনোরম ভুল করেছিল।

সীতা তাকে দেখেছিল ঠিকই। দোকানের আয়নায় প্রতিবিম্বিত মনোরমকে। একটু চমক কি লেগেছিল? কে জানে! কিন্তু সেই মুহূর্তেই ভুল হয়ে গেল বিচ্ছেদ, অন্য এক পুরুষ, বহুকালের অদর্শন। তীব্র অভিমানে ফুলে উঠল সীতার বালিকা-মুখের দুটি ঠোঁট, ভ্রূ কুঁচকে গেল।

একটুও ভাবল না সীতা, অপেক্ষা করল না, কোনো ভূমিকাও না। কিশোরীর মতো দ্রুত নৃত্য-ছন্দে কয়েক পা দৌড়ে গেল মনোরমের দিকে। বুক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কৃশ, সাদা মুখখানা তুলে ধরে বলল—আমার যে কী ভীষণ অসুখ করেছিল!

মনোরম তাকিয়েই থাকে। বিভ্রম?

সীতা তার রোগা, পাণ্ডুর ডান হাতখানা তুলে নিঃসঙ্কোচে তাকে দেখাল, বলল—দেখ কত রোগা হয়ে গেছি!

পৃথিবীতে মানুষের আয়ু খুব বেশীদিন নয়। বয়ে যাচ্ছে সময়। দ্রুত, কলস্বরা। মনোরম তাই বিনা প্রশ্নে সীতার রোগা হাতখানা ছুঁল।

সেই মুহূর্তেই তাদের চারধার থেকে কলকাতা মুছে যাচ্ছিল। জেগে উঠল বনভূমি। অদূরে নদীর শব্দ।

সমাপ্ত